ইতিহাসের ধারা

সুশোভন সরকার

মনীষা
কলিকাতা

ITIHASER DHARA : *Prof.* Susobhan Sarker
Price : Rs. 10/-
প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৪
পঞ্চম সংস্করণ : ১৯৭৫
ষষ্ঠ সংস্করণ : ১৯৮১

প্রকাশক : মাণ সান্যাল
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা ৭০০০১২

মুদ্রক : আর্টপুল
৬/১ শ্রীমন্ত দে লেন
কলিকাতা ৭০০০১২

মুখবন্ধ

'ইতিহাসের ধারা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে, অমিত সেন এই ছদ্মনামে। বইটির চার সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গেছে, অথচ এখনো তার কিছুটা চাহিদা আছে, যেমন নূতন বাংলাদেশে। মনীষা গ্রন্থালয় তাই এর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছেন। লেখাটা অনেকখানি পরিমার্জিত করা হয়েছে, কিন্তু ১৯৫৭ সালের পরবর্তী ঘটনাসমূহ নির্দেশ বা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়ে উঠল না নানা কারণে।

'ইতিহাসের ধারা' লেখা হয় সাধুভাষায়, তখনকার নেতাদের নির্দেশে। তাঁদের যুক্তি ছিল কলকাতার বাইরে এই ভাষাই নাকি বেশি সহজবোধ্য। আজ নিশ্চয় খবরের কাগজের কল্যাণে অবস্থা বদলে গেছে, তবুও এতে সাধু ভাষাই বজায় রাখা হল। এই ভাষা একেবারে বর্জনীয় নয়, বরং গুরুগম্ভীর প্রসঙ্গে এর খানিকটা উপযোগিতা আছে বলেই আমার বিশ্বাস। চল্‌তি ভাষার স্রোতের মধ্যে সাধু বাংলা খানিকটা মুখ-বদলের স্বাদও এনে দিতে পারে।

পেশাদারী ঐতিহাসিকেরা এই লেখার মধ্যে অনেক খুঁত দেখতে পাবেন। তাঁদের চোখে পড়বে এর ব্যাপক ব্যাখ্যার চেষ্টা, দলগত দৃষ্টিভঙ্গি, সহজ সামান্যকরণের প্রয়াস, সরলতার খাতিরে পুনরাবৃত্তির দোষ, বিতর্কমূলক সিদ্ধান্ত, হয়তো বা কিছু ফ্যাক্টের ভুল। তাঁরা কিন্তু এই ধরনের দরকারি কাজে হাত দিতে নামবেন না—নাম খারাপ হবার ভয়ে। সৌভাগ্যবশতঃ বর্তমান লেখকের ঐতিহাসিক-মহলে এমন কিছু প্রতিষ্ঠা নেই যা হারাবার আশঙ্কা আছে কিছু থাকলেও হারাবার ঝুঁকি নিতে লেখক প্রস্তুত।

বইখানি পণ্ডিত-মহলের জন্য নয়, তাঁরা অনেক জানেন—তাঁদের শেখাবার স্পর্ধা আমার নেই। এ লেখা কমিউনিস্ট কর্মীদের জন্য। এঁদের নানা বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা নিতে হয়; তখন গোটা ইতিহাসের একটা পটভূমিকা হাতের কাছে থাকলে অনেক সুবিধা। বইটি তাঁদের কাজে লাগলেই সার্থক হবে।

সুশোভন সরকার

৫ জানুয়ারি ১৯৭৫

সূচীপত্র

মার্কসবাদের নানাদিক

আজ হইতে এক শতাব্দীর কিছু আগে কার্ল মার্কস ও তাঁহার চিরজীবনের বন্ধু ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস কমিউনিস্ট আন্দালন আরম্ভ করেন। ইহার প্রভাব এখন পৃথিবীর সর্বত্র, এমন-কি আমাদের দেশে পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রুশদেশে আমরা এই সাম্যবাদী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি দেখিতে পাই। সেখানে লেনিনের নেতৃত্বে আসিয়াছে বিরাট বিপ্লব; সেদেশেই এখন নূতন শ্রেণীহীন সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে তাঁহার অনুগামীদের নির্দেশে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব ইওরোপ ও বিশাল চীনদেশ এবং সম্প্রতি ক্ষুদ্র কিউবা দ্বীপও, এই পথে পা বাড়াইয়াছে। কমিউনিজম অর্থাৎ সাম্যবাদ কোন বিশেষ দেশ বা জাতির সম্পত্তি নয়; ইহার বিস্তার কোন একটা এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। পরিবর্তনের ক্রমবিকাশ আজ সারা মানব-সমাজকেই এইপথে টানিতেছে। ভূগোলের এক-একটা অঞ্চলে অসংখ্য নদীপথ চোখে পড়ে, তাহাদের প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাদের জলস্রোতের গতি একই দিকে। বিশ্বসংসারে মানুষের রাজ্যেও সেইরকম নানা জাতির মধ্যে পার্থক্য থাকে, কিন্তু পরিবর্তনের প্রবাহের মধ্যে তাহাদের অগ্রগতির একটা সাধারণ লক্ষ্য অনেক সময়ই থাকিয়া যায়। ইতিহাসের আলোচনায় আমরা মানব-সমাজের এই ধরনের স্বাভাবিক পরিণতির সন্ধান পাই।

মানুষের সমাজে প্রগতির স্বাভাবিক ঝোঁক এখন শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের দিকে। সজাগ হইয়া সেই ঝোঁকের সহায়তা করার নামই সাম্যবাদ। সাম্যবাদ ছাড়া অন্য সমস্ত মত বা দল সম্বন্ধে একটা সাধারণ কথা বলা যায়। তাহাদের মধ্যে অনেকেই সামাজিক পরিবর্তনকে বাধা দিবার সাধ্যমতো চেষ্টা করে। অন্যেরা অগ্রগতির সহায় হইয়াও তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া যায়; তাহারা তাই অন্ধের মতো পথ হাতড়াইয়া চলে। মানুষের ইতিহাসে পরিবর্তন সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা আর চেতনা সাম্যবাদের প্রাণ; কমিউনিস্ট আন্দোলনের আশ্চর্য জীবনীশক্তির মূল উৎস এইখানে।

সাম্যবাদী চিন্তাধারা ও কার্যপ্রণালীর প্রথম পথ-প্রদর্শক হিসাবে মার্কস-এর নাম অমর। সেইজন্য সাম্যবাদকে মার্কসবাদ বলা হয়। লেনিন সার্থক ও সফল প্রয়োগের ভিতর দিয়া বিকশিত করিয়া তোলেন বলিয়া এই মতবাদকে আমরা অনেক সময় মার্কস-লেনিনবাদ আখ্যা দিই। তবুও ইহাকে সংক্ষেপে মার্কসবাদ বলা অন্যায় নয়, কারণ বিকাশ বা সম্প্রসারণ বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তামাত্রের লক্ষণ, তাহাতে তাহার মূল প্রকৃতির বদল হয় না।

সাম্যবাদের আসল রূপ অখণ্ড ও ব্যাপক, তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া দেখা অসংগত। তাহার আলোচনার কিন্তু কয়েকটি প্রধান দিক আছে। এই-সকল বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান সাম্যবাদী কর্মীদের পক্ষে প্রয়োজন।

প্রথমত, ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে আমাদের কিছু ধারণা থাকা আবশ্যক। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি মানব-সমাজ যুগে যুগে কী রূপ গ্রহণ করিয়াছে, সমাজের পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, অতীত বা বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার আসল অর্থ কোন্‌খানে, সমাজের পুনর্গঠনে কোন্ চেষ্টা সার্থক আর কোন্‌টাই বা নিষ্ফল।

দ্বিতীয়ত, মানুষের জীবনযাত্রার সঠিক খবর রাখিতে হইলে অর্থনীতির কতকটা আলোচনা ছাড়া চলে না। তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি সাধারণ লোকের দুঃখ-কষ্টের মূল কোন্‌খানে, কোন্ আর্থিক ব্যবস্থার ফলে এতকাল দেশের অধিকাংশ লোক নির্যাতিত হইয়াছে, শোষণের প্রণালী কোন্ পথে চলিয়াছে, তাহার কোন্ দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সাধারণ লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সমাজের পুনর্গঠন সম্ভব।

মার্কসবাদের তৃতীয় দিক একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, তাহার দার্শনিক নাম ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ। এইখানে বিজ্ঞানের সঙ্গে সাম্যবাদের গভীর যোগ দেখা যায়, ইহারই সাহায্যে সমস্ত বিশ্বসংসারের আসল প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করিতে পারি। বাহিরের প্রকৃতির জগৎ, মানুষের সামাজিক ক্রমবিকাশ, আর মানুষের চিন্তার ধারা—এই-সমস্তই কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মানিয়া চলে; প্রত্যেকটির সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা রাখিতে হইলে তাই একটা মূল ব্যাপক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির প্রয়োজন হয়। তখন আমরা বুঝি যে, সমাজে সাম্যতন্ত্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা কল্পনাবিলাস নহে, তাহার একটা বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি আছে। সাম্যবাদ ভবিষ্যতের স্বর্গরাজ্যের কাল্পনিক ছবি নয়, বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টির একটা বিশেষ অঙ্গের নামই সাম্যবাদ।

রাজনৈতিক কাজের ধরন মার্কসবাদের চতুর্থ দিক। এইখানে স্টেট বা রাষ্ট্রশক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা শিক্ষা লাভ করি, সমাজে শ্রেণী-বিভাগের প্রভাব বুঝি, এবং শ্রেণীহীন সাম্যতন্ত্রী সমাজ গড়িবার পথের সন্ধান পাই। সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির কথা জানিবার প্রয়োজন আসে। এই পার্টিই সমাজবাদী বিপ্লবের প্রধান ধারক শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব দল, নির্যাতিত সাধারণ লোকের প্রকৃত নেতা, এবং সাম্যতন্ত্রের সাধনার প্রধান উপায়। পার্টির মূল উদ্দেশ্য ও গঠন-কৌশল, তাহার অতীত ইতিহাস, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ শক্তিবৃদ্ধির উপায়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহার কাজের বিভিন্ন ধরন—ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ প্রত্যেক সাম্যবাদীর কর্তব্য।

মার্কসবাদের পঞ্চম দিক, স্বদেশের অবস্থা ও স্থানীয় সমস্যার আলোচনা। সাম্যবাদ কতকগুলি মন্ত্র বা বাঁধা বুলি নয়, প্রতি দেশে প্রতি মুহূর্তে সাম্যবাদী দলকে চারিদিককার অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিতে হয়। মূল উদ্দেশ্য ও কাজের সাধারণ পদ্ধতি অবশ্য সর্বত্রই এক, কিন্তু স্বভাবতই মূলনীতি প্রয়োগের বিশেষ রূপ নির্ভর করে বিশেষ অবস্থার উপর। ভারতীয় মার্কসবাদীকে তাই সর্বদাই দেশের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা এবং বাহিরের পরিবর্তনধারার ভারতের উপর ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইবে। ভারতবর্ষে মার্কস-এর মূলনীতি প্রয়োগের বিশেষ উপায় এদেশে সাম্যবাদীদের শিক্ষার এক অতি প্রয়োজনীয় অংশ।

সাম্যবাদের ষষ্ঠ দিক হইল সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক

অন্য দেশের অভিজ্ঞতার কথা, জগতের যে-অংশটি আজ সামাজিক প্রগতিতে অন্য সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে তাহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। সোভিয়েট দেশে প্রথম শ্রমিক-বিপ্লব সফল হয়, সেখানে এখন শ্রেণী-বর্জিত সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে। পূর্ব ইওরোপ, চীন ও কিউবাতেও আজ জনগণের বিপ্লব বিজয়ী। সেখানে নূতন ধরনের জনগণতন্ত্রী রাষ্ট্রগঠন সমাজতন্ত্রের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সেখানেও নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবার প্রধান বাধা অপসারিত হইয়াছে, যদিও আরো অনেক বাধা নিশ্চয় পরে অতিক্রম করিতে হইবে। সকল মার্কসবাদীর পক্ষে তাই এই বিচিত্র, দুঃসাহসিক, অনেকাংশে সার্থক অথচ কঠোর অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিছুটা পরিচয় থাকাচাই।

সাম্যবাদী আন্দোলনে যুক্ত থাকিয়া প্রতিদিনের কাজের মধ্যেই মার্কসবাদ আয়ত্ত করিবার শ্রেষ্ঠ পথ আছে। তাহা হইলে শুধু পুঁথি-পড়া মুখস্থ বিদ্যার বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু সেই প্রাত্যহিক কাজের সঙ্গে সঙ্গেই সাম্যবাদের ভিন্ন ভিন্ন দিক সম্বন্ধে শিক্ষা ও আলোচনা চলা উচিত। নহিলে সাময়িক ক্ষুদ্র স্বার্থের সন্ধানে মূল লক্ষ্য হইতে বিচ্যুতি আসে, ভুল সংশোধনের উপায় থাকে না। এই আলোচনায় কিছু সাহায্য করাই এই লেখার উদ্দেশ্য।

ইতিহাসের মূল প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

মানুষের আজিকার অবস্থা একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়, অতীতের বহু পরিবর্তনের ফলে বর্তমান সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানকে বুঝিতে হইলে তাই ইতিহাসের আশ্রয় ছাড়া গতি নাই।

কিন্তু ইতিহাস আসলে কী সে-বিষয়ে অনেক মতভেদ দেখা যায়। প্রাচীনকালে ইতিহাস ছিল শুধু ব্যক্তিবিশেষের কীর্তির কথা। সে-কালের পুরাণ ও গাথাগুলির প্রায় একমাত্র আলোচ্যই ছিল মহাবীরদের কৃতিত্বের গল্প। এখন পর্যন্ত কেহ কেহ ইতিহাসের মধ্যে শুধু মহাপুরুষদের জীবনচরিত খোঁজেন। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় ইতিহাসের আলোচনা করিতে করিতে আমরা বুঝিতে শিখিয়াছি যে, সমস্ত সমাজ বা জাতির ক্রমবিকাশের কথাই হইল ইতিহাসের সারমর্ম। অনেকে বলেন যে, সমাজের এই বিকাশ মহাপুরুষদেরই কাজের ফল; তাই শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের কথাই আমাদের জানিতে হইবে। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের জীবনের আলোচনায় ব্যস্ত থাকিলে সমস্ত ইতিহাসের কোনো ধারা বা বিশেষ রূপ আমাদের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না। সমাজের জীবন একটা স্রোতের প্রবাহের মতন, তাহার নিজস্ব গতির রূপটিকে ফুটাইয়া তোলাই ঐতিহাসিকের কাজ। সেই জীবনের উপর মহাপুরুষেরা তাঁহাদের ছাপ অবশ্যই রাখিয়া যান, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, যুগের উপযোগী কাজ করিতে না পারিলে মহাপুরুষ হওয়া যায় না, যুগের সঙ্গে তাল রাখিতে না পারিলে মাহাত্ম্যও ম্লান হইয়া আসে। সেইজন্য কোন যুগকে বুঝিবার চেষ্টাই সেই যুগের ইতিহাস, ব্যক্তিবিশেষের কীর্তি বা অপকীর্তির সন্ধান তাহার একটা অংশ মাত্র।

বহুদিন ধরিয়া ইতিহাস বলিতে লোকে শুধু কতকগুলি রাষ্ট্রিক ঘটনার সমষ্টিকে বুঝিত। ঐতিহাসিকেরা এখনো অনেকে রাজা-রাজড়ার যুদ্ধ, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ঝগড়া বা বন্ধুত্ব, এবং শাসনযন্ত্রের পরিবর্তনের কথা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু ক্রমে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, প্রকৃত ইতিহাস শুধু কয়েকটি চমকপ্রদ ঘটনার গল্প নয়, রাজনীতিও তাহার মূল কথা নহে। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ নানারকমের সমাজ গড়িয়াছে; তাহাদের আরম্ভ, বিকাশ, পরিণতি আর শেষ লইয়াই ইতিহাসের আসল কারবার। মানুষ-মাত্রের জীবনযাত্রা সমাজ-নির্ভর, সমাজ-শাসিত। সুতরাং ইতিহাস মূলত সমাজেরই ইতিহাস, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর লীলাখেলা নয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ রাষ্ট্রবিপ্লব বা অন্য কোনো ঘটনা যদি সামাজিক জীবনযাত্রার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহারা যথার্থ ইতিহাসের উপাদান হইয়া ওঠে, অন্যথা নয়।

আজকাল অবশ্য অনেকেই ইতিহাসকে সমাজের জীবনের ছবি হিসাবে দেখেন। কিন্তু এখন অনেক সময় আবার জীবনযাত্রার সকল দিককেই নির্বিশেষে ইতিহাসের এলাকার মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা হয়; ঐতিহাসিকের চোখে কোন্ দিকটার মূল্য বেশি, কোন্‌টার স্থানই বা সামান্য, সেই বিচার তখন থাকে না। এই জাতীয় ইতিহাস সমাজের যথার্থ ব্যাখ্যা না হইয়া ফোটোগ্রাফ হইয়া পড়ে। এই পদ্ধতিতে দুইটি বিপদ আছে। ঐতিহাসিক হয় নানা কথা বলিতে গিয়া টুকরা টুকরা অসংখ্য তত্ত্ব বা ফ্যাক্টের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলেন, তাঁহার লেখা বিশৃঙ্খল আকার ধারণ করে। নয়তো ইতিহাসের কোনোরকম ঐক্য আর থাকে না; তাহার বদলে আমরা পাই জীবনের নানাদিকের খণ্ড খণ্ড আলোচনা, পরস্পরের মধ্যে যোগ-হীন ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারের পৃথক বর্ণনা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মাত্রেই জড় জগতে মূলসূত্রের খোঁজ করেন, ঐতিহাসিকও তেমনি সামাজিক জীবনের বিকাশের মধ্যে কোনো মূলধারার সন্ধান না পাইলে ইতিহাস শুধু কতকগুলি আলাদা আলাদা ছবির সংগ্রহ থাকিয়া যায়, সে আলোচনার কোন বিশেষ সার্থকতাও চোখে পড়ে না। ক্রমবিকাশের কোনো ধারা খুঁজিয়া না পাইলে ইতিহাস নিরর্থক প্রতিপন্ন হয়।

আসল কথা, ইতিহাস-লেখক মাত্রেই তাঁহার আলোচনার মধ্যে

একটা মূল ধারা খুঁজিয়া পাইবার আশা রাখেন, যদিও তর্কের খাতিরে কোনো কোনো পণ্ডিত এখনো বলিয়া থাকেন যে, ইতিহাসের কাজ শুধু ঘটনার যথাযথ বর্ণনা, ক্রমবিকাশের কোনো সাধারণ সূত্রের সন্ধান নয়। আজ পর্যন্ত তাই ইতিহাসের নানা জাতীয় ব্যাখ্যার চেষ্টা হইয়াছে ; তাহার মধ্যে প্রায় সকলগুলিকেই পণ্ডশ্রমের পর্যায়ে ফেলা যায়। কিন্তু গত শতাব্দীতে মার্কস ও এঙ্গেলস ইতিহাসের যে-বাস্তব ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার যথার্থতা যেন দিন দিন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। কমিউনিস্টদের ইতিহাসের ধারণা সেই ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। অতীতের আলোচনা আর বর্তমানের অভিজ্ঞতা বারবার আমাদের এই ধারণাকে বদ্ধমূল করিতেছে।

মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ইতিহাসকে বুঝিবার চেষ্টা করিলে মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথমে এইগুলি লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করা যাক।

ইতিহাসের প্রথম কথাই হইল পরিবর্তন। মানুষের জীবনযাত্রা চিরকাল একভাবে চলে না, সামাজিক কোন ব্যবস্থা নানা কারণে দীর্ঘ দিন টিকিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহারও আরম্ভ ছিল এবং পরিবর্তন আসিবে। এই কথা সকল প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ-সংগঠনের সকল দিক সম্বন্ধেই খাটে। কোন প্রথা তাই অনাদি বা অনন্ত হইতে পারে না। মানুষের ইতিহাস প্রবহমান স্রোতের মতন, সেখানে চিরস্থির বা সনাতন কিছু নাই। বৈজ্ঞানিকেরা এই ধারণাকে এভলিউশন বা ক্রমবিকাশ নাম দিয়াছেন, কিন্তু এই বিবর্তন যে সর্বব্যাপী এ কথা দার্শনিক হেগেল প্রথম স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, এবং মার্কসের মতবাদেই এই ধারণা যোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভলিউশন শুধু প্রাণীজগতের নিয়ম নয় ; একদিকে জড়জগতের মধ্যেও চিরস্থিরতা নাই, অন্যদিকে রাজ্যের উত্থান-পতনে, বিশেষ কোন সামাজিক বিধিব্যবস্থার আরম্ভ ও শেষে, এমন-কি মানুষের জ্ঞান, ধারণা ও চিন্তার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসের ভিতর প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যাপারই পরিবর্তনের এই গতি।

এই প্রসঙ্গে দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে। সকল রকমের সনাতনী রক্ষণশীলতার সাধারণ লক্ষণ এই গতিকে অস্বীকার করা, ইহাকে দেখিয়াও না দেখিবার চেষ্টা। মার্কসবাদ কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই পরিবর্তনকে স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়াই গ্রহণ করে। অন্যদিকে

পরিবর্তনের অর্থ পুরাতনের সঙ্গে সকল যোগ ছিন্ন হওয়া নয়। আগের অবস্থা রূপান্তরিত হইয়া চলে, কিন্তু নূতন ব্যবস্থার সঙ্গে পুরাতনের কিছু সম্পর্ক থাকিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। উগ্র চরমপন্থীরা এই সহজ কথাটা বুঝিতে চাহে না। মার্কসবাদে দেখিবার ভঙ্গি বিজ্ঞানসম্মত বলিয়াই অনেক সময় তথাকথিত চরম মতবাদের আস্ফালন আমাদের কাছে হাস্যাস্পদ বলিয়া মনে হয়।

ইতিহাসের দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে, পরিবর্তন সমান বেগে চলে না, পরিবর্তনের তাল অসমান হওয়াই যেন প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষের বিধিব্যবস্থা কিংবা ধারণার মধ্যে তাই পরিবর্তন কখনো আসে প্রচণ্ড দ্রুতবেগে, আবার কখনো বা অত্যন্ত মৃদুমন্দভাবে। এই অসমান গতির জন্যই ক্রমবিকাশের ধারা সব সময় ঠিক সমানভাবে অগ্রসর হয় না। আমরা সকলেই জানি যে, কখনো কখনো শতাব্দীর পর শতাব্দী সমাজের অবস্থা প্রায় একই রকম থাকে—আমাদের দেশে প্রাচীন ব্যবস্থা যেমন দীর্ঘস্থায়ী ছিল। আবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যে মানুষের জীবনে বিশাল পরিবর্তন আসাও বিচিত্র নয়—ফরাসী ও রুশ বিপ্লবের সময় আমরা তাহার উদাহরণ দেখি। পরিবর্তনের অসমান গতির আরো একটি দিক আছে। ক্রমবিকাশের পথে কোনো দেশ বা জাতি এক-এক সময় অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর হইয়া যায়, কিন্তু যাহারা পিছনে পড়ে তাহারা যে বরাবরই সেই অনুপাতে পিছনেই থাকিবে এ কথা বলা চলে না। ইতিহাসে বারবার দেখিতে পাই যে, অগ্রবর্তীরা পিছাইয়া পড়িতেছে, আবার অনুন্নত জাতি আগাইয়া আসিয়াছে। উনিশ শতকে রাশিয়ার সমাজ ইংল্যাণ্ডের বহু পিছনে ছিল, এখন রুশদেশ পৃথিবীর সকলের চাইতে অগ্রসর। এই অসমান গতির অবশ্য অনেক কারণ থাকে, ইতিহাস-লেখক বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সন্ধান পাইতে পারেন। কিন্তু পরিবর্তনের বেগ অসমান না হইলে সমস্ত ক্রমবিকাশ একটা যান্ত্রিক আকার লইত। আসলে ইতিহাসে অনেক বৈচিত্র্য আছে এ কথা বুঝিতে বেশি পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না।

সমাজের মধ্যে পরিবর্তনের স্রোত সাধারণত ধীরে ধীরে বহিয়া চলে। কিন্তু যুগান্তরের সময় হঠাৎ বিপুল বেগে পরিবর্তন আসিয়া পড়ে—ইতিহাসে এই পর্যায়গুলিকে আমরা বিপ্লব বা অকস্মাৎ বিরাট পরিবর্তন নাম দিয়া থাকি। ইতিহাসের তৃতীয় বিশেষত্ব

এইখানে—আর ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নাই। ক্রমবিকাশ যেমন অনেক সময় ধীরে ধীরে চলে, তেমনই আবার মাঝে মাঝে হঠাৎ লাফ দিয়া অনেকখানি পথ আগাইয়া যাওয়াও স্বাভাবিক নিয়ম। হঠাৎ-পরিবর্তনকে অস্বাভাবিক মনে করা কিংবা ধীরে ধীরে অবস্থার বদলকে অগ্রাহ্য করা—এই দুইটি শুধু বুঝিবার ভুল। অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল বদলই বিপ্লবের আসল অর্থ, কী উপায়ে সেই বদল আসে সেটা অন্য কথা, সব ক্ষেত্রে এক পদ্ধতি প্রযোজ্য না হওয়াটাই সম্ভব।

চিরস্থিতির ধারণা পরিত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা যখন এভলিউ-শনের আশ্রয় লইলেন তখন বৈপ্লবিক বদলের কথাটা অনেকেই স্বীকার করেন নাই; মার্কসবাদ বিপ্লবকেও প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে স্থান দিয়াছে। এভলিউশনের এই স্বভাবের দিকে হেগেল প্রথম লোকের চোখ ফেরান। জলের উত্তাপ ধীরে ধীরে বাড়িয়া চলিলে হঠাৎ একটি মুহূর্ত আসে যখন তাহার গুণেরও পরিবর্তন হয়, জল বাষ্পের আকার ধারণ করে। আবার জলের তাপ ধীরে ধীরে কমিয়া চলিলে হঠাৎ জল এক মুহূর্তে বরফ হইয়া যায়। ইহার অনুরূপ পরিবর্তনের অনেক উদাহরণ আমরা প্রকৃতির রাজ্যে পাই—সামাজিক জীবনে তাহার তুলনা মেলে বিপ্লবের মধ্যে।

সাম্যবাদের বিশ্বাস যে, বিপ্লবকে বাদ দিয়া অগ্রগতি চলিতে পারে না, আবার সকল অবস্থাতেই যে বিপ্লব হইতে পারে তাহাও নহে।

অবশ্য ইতিহাসে আকস্মিক পরিবর্তন ঠিক মুহূর্তসাধ্য ব্যাপার নয়—আকস্মিকতা এখানে একটা আপেক্ষিক কথা, মন্থর পরিবর্তনের চমকপ্রদ বিপরীত। তাই ইংরাজ, ফরাসী বা রুশ বিপ্লব ঠিক একদিনে সম্পন্ন হয় নাই। এক সমাজ হইতে অন্য সমাজে রূপান্তর আবার অনেক সময় দীর্ঘ দিনের ব্যাপার যদিও সমাজ-কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হয় অনেক বেশি তাড়াতাড়ি।

চতুর্থত, ইতিহাসে যেখানেই শ্রেণীভেদ চোখে পড়ে সেখানেই হয় প্রকাশ্যে নয়তো প্রচ্ছন্নভাবে শ্রেণী-বিরোধের অস্তিত্ব থাকে। কমিউনিস্ট ইস্তাহারে (ম্যানিফেস্টো) মার্কস ও এঙ্গেলস্ বলিয়াছেন যে, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের সমস্ত ইতিহাস আসলে শ্রেণী-সংগ্রামের কাহিনী। খাওয়া-পরা ও অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস প্রস্তুত,

সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যবস্থা না থাকিলে কোনো সমাজ টিকিতে পারে না। মানুষের প্রত্যেক সমাজে তাই অভাব মিটাইবার জন্য উৎপাদনের ব্যবস্থা রাখিতে হয়। সেই ব্যবস্থা আবার সব সময় সর্বত্র একভাবে চলে না; তবু সমাজের প্রকৃতি মোটামুটি নির্ভর করে উৎপাদনের আর্থিক বিধিব্যবস্থার উপর। জমি প্রভৃতি যে-সব উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলি আছে তাহাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থাকিলে সেই অনুসারে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী থাকিতে বাধ্য। এই শ্রেণীগুলির স্বার্থ স্বভাবতই স্বতন্ত্র, তাই তাহাদের মধ্যে বিরোধ কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজকে ধরিয়া রাখিয়া কাজ চালাইতে হইলে শ্রেণীবিশেষের প্রভুত্ব দরকার হয়। দাস-প্রথার আমলে দাসদের মালিকেরা সমাজের কর্তা; আজকাল ক্যাপিটালিস্ট বা ধনতান্ত্রিক সমাজে তেমনিই ধনিক শ্রেণী সর্বেসর্বা। কিন্তু প্রভু-শ্রেণীর সঙ্গে বঞ্চিত সাধারণ লোকের স্বার্থের বিরোধ চাপা থাকিলেও লোপ পাইতে পারে না, কারণ যাহাতে প্রভুর লাভ তাহাতে অধীনের অন্তত অনেকখানি ক্ষতি হইতে বাধ্য।

ধারাবাহিক সামাজিক ইতিহাস যতদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন হইতে শ্রেণী-বিভাগ সকল সমাজেরই মূল কাঠামো হইয়া রহিয়াছে। যুগে যুগে অবশ্য শ্রেণীগুলির রূপ আর তাহাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবের অদলবদল দেখা যায়, কিন্তু শ্রেণী-বিরোধের অবসান হইতে পারে নাই। তাই ইতিহাসকে প্রধানত শ্রেণী-সংগ্রামের এবং শ্রেণী-সম্বন্ধের নানা রূপান্তর লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়। মার্কসই প্রথম এই কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারেন। আজ তাই যে-কোনো যুগে নানা অবান্তর কথার আড়াল হইতে আমরা ইতিহাসের মূল রূপটি ধরিতে পারি, ঘটনা-প্রবাহের আসল তাৎপর্য তখন সহজেই বোঝা যায়।

অবশ্য মানুষের মধ্যে আর সমাজের জীবনে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। ইতিহাসে বহুর প্রকাশকে তাই মার্কসবাদ অগ্রাহ্য করে না। এখানে সাম্যবাদের পঞ্চম কথা এই বহুবিধ বিধিব্যবস্থা, আয়োজন, আচরণ, কর্ম ও চিন্তার মধ্যে মূল উৎসের অনুসন্ধান। শ্রেণী-বিভাগ সমাজের মূলে থাকে, সামাজিক জীবনের বাহিরের সকল প্রকাশে সেই ঘাত-প্রতিঘাত স্পষ্ট ফুটিয়া না উঠিতে পারে। কিন্তু গৃহের ভিত্তি বাহির

হইতে চোখে না পড়িলেও, তাহার উপর বাড়িখানির প্রকৃতি নির্ভর করে নিশ্চয়। প্রতিমার কাঠামো দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু মূর্তির গড়নকে সেই কাঠামোই নিয়ন্ত্রিত করে না কি? সমাজেও তেমনি বাহিরের কারুকার্য থাকে, কিন্তু আর্থিক ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন-প্রথা এবং তাহা হইতে উদ্ভূত শ্রেণী-সম্বন্ধই হইল আসল কথা। গাছের ডাল-পালার বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু মূল শিকড়ের কথা ভুলিলে চলিবে কেন? মানুষের শিল্পকলা, চিন্তার স্ফূর্তিকে আমরা গাছের ফুল-ফলের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি, কিন্তু মাটি হইতে যে-রস টানিয়া আনা হয় হয় তাহার উপর ফুল-ফল শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে।

এইখানেও দুই রকমের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সামাজিক জীবনের বাহিরের বৈচিত্র্যকে কেহ কেহ একেবারে অস্বীকার করিয়া উড়াইয়া দিতে পারে; আবার অনেকে ভাবে যে বাহিরের প্রকাশটাই আসল, তাহার মূল অনুসন্ধান কষ্টকল্পনা মাত্র। এই দুই মতের কোনোটিই মার্কসবাদ নহে। সাম্যবাদীরা বিশ্বাস করে যে, সমাজের জীবনের নানাদিকের মধ্যে একটা গভীর যোগ আছে, সেই মূলসূত্র পাওয়া যায় আর্থিক বিধিব্যবস্থার মধ্যে, কিন্তু ভিতরের সেই কাঠামোকে অবলম্বন করিয়া বাহিরের প্রকাশ নানা মূর্তি গ্রহণ করিতে পারে।

ইতিহাসের শেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, উৎপাদন-প্রথা ও আনুষঙ্গিক আর্থিক বিধিব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সমাজ গড়িয়া ওঠে, সামাজিক জীবন ও সভ্যতার চেহারাও বদলাইয়া যায়। এইভাবেই আমরা এক যুগ হইতে অন্য যুগে উপস্থিত হই, সমাজের এক স্তর হইতে অন্যস্তরে আসিয়া পড়ি। মধ্যযুগের ফিউ-ডাল জগৎ এইরূপে আধুনিক ধনতন্ত্রে পরিবর্তিত হইয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে নূতন আর্থিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়ার জন্যই আমরা এখন নূতন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার দরজায় পৌঁছিয়াছি। ইতিহাসে আমরা বিভিন্ন সমাজের পরিচয় পাই; তাহাদের মধ্যে মূল প্রভেদের অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থা ও আর্থিক গড়নের দিকেই নজর দিতে হইবে।

পরিবর্তনের অন্তহীন প্রবাহ, সেই ক্রমবিকাশের অসমান গতি, স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবেই মাঝে মাঝে বিপ্লবের আবির্ভাব, শ্রেণী-

বিভক্ত সমাজে ক্রমান্বয়ে শ্রেণী-বিরোধ, সামাজিক জীবনে বাহিরের সকল বৈচিত্র্যের আড়ালে শ্রেণী-স্বার্থের প্রাধান্য এবং শ্রেণী-সম্বন্ধ বদলাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সমাজের উদয়—এই কয়েকটি কথাকে আমরা ইতিহাসের প্রধান বিশেষত্ব বলিয়া ধরিতে পারি। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটিতে দেখিবার যে ভঙ্গি ধরা পড়ে, তাহার সাধারণ নাম ডায়ালেকটিক; বিশ্বসংসারে গতির বেগকে মানিয়া লইয়া তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা ইহার প্রকৃতি। হেগেল এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার করেন। তাঁহার দার্শনিক বিশ্লেষণে বোঝা গেল, যে পরস্পর-বিরোধী শক্তির সংঘাত এই গতির মূলে রহিয়াছে, সেই স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব হইতেই জগতে পরিবর্তন আসে। ডায়ালেকটিক নামটির অর্থই হইল দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া প্রগতি। কিন্তু ভাববাদী দার্শনিক হেগেল দ্বন্দ্ব বলিতে আইডিয়া অথবা ধারণার ঘাত-প্রতিঘাত বুঝিতেন, সেই আইডিয়ার অস্তিত্ব মানুষের কিংবা পরমাত্মার চেতনার মধ্যে। বস্তু-বাদী মার্কস ও এঙ্গেলস দ্বন্দ্বকে প্রকৃত বাস্তব শক্তির সংঘাত হিসাবে দেখিলেন। ইহার ফলে তাঁহাদের চোখে ইতিহাসের অন্য বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়িল—উপরে বর্ণিত শেষ তিনটি বিশেষত্ব তাঁহাদেরই আবিষ্কার। তাঁহাদের শিক্ষার ভিতর দিয়া আমরা এইভাবে ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যার পরিচয় পাইলাম—তাহার মূলে রহিয়াছে ডায়ালেক-টিক বস্তুবাদ। ইতিহাসের ধারার সন্ধান করিতে করিতে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রচলিত অন্য সকল ব্যাখ্যার চাইতে এই মার্কস-বাদই আমাদের বুদ্ধি ও মনকে বেশি তৃপ্তি দেয়।

বিভিন্ন ধরনের সমাজব্যবস্থা

যুগে যুগে মানুষের সামাজিক জীবনের পরিবর্তন ইতিহাসের গোড়ার কথা। প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের উৎপাদনে এবং বণ্টনে আর্থিক বিধিব্যবস্থার বদলই আবার সেই পরিবর্তনের মূলে থাকে। ইতিহাসে আমরা তাই উৎপাদন-প্রথার কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সন্ধান পাই, তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই বিভিন্ন যুগের সমাজ গড়িয়া ওঠে।

বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, মানুষের আদিপুরুষ হইল উন্নত স্তরের বানর-জাতীয় জীববিশেষ। এই আদি পর্যায় হইতে প্রকৃত মানুষের বিবর্তনের মূলে আছে সম্ভবত মানুষের পরিশ্রম। যুগব্যাপী হাতের ব্যবহার ও হাতের পরিশ্রম আশ্রয় করিয়াই মানুষ দুই পায়ে খাড়া দাঁড়াইতে শিখিল; এই ধরনের খাড়া হইয়া সর্বদা থাকা অন্য বানরে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। হাতের কাজের ভিতর দিয়া আসিল হাতিয়ার সৃষ্টি, যে-বিদ্যাও অন্য পশুদের কাছে অজানা থাকিয়া গিয়াছে। খাড়া চলাফেরা ও হাতের কাজের ফলে মানুষের মস্তিষ্ক তাহার জটিল ও কুশল রূপ পায়। মস্তিষ্কের অগ্রগতি ও হাতের পরিশ্রমের ফলে মানুষের নিজেদের মধ্যে ধারণা-বিনিময় আবশ্যিক হইয়া পড়ে। ইহা হইতেই ভাষার উৎপত্তি।

মনুষ্যজাতির শৈশবকালের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু সেই আদিম যুগের অবস্থা সম্বন্ধেও নানা উপায়ে কিছু ধারণা করা যায়। পৃথিবীর সব অঞ্চলেই প্রাচীনকালের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, সে-সময়কার মানুষের নিত্যব্যবহার্য অনেক জিনিসের সন্ধান পুরাতত্ত্ববিদেরা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে আদিম মানুষের জীবনযাত্রার ধরন বোঝা খুব শক্ত নয়। খাদ্যসংগ্রহ ও আত্মরক্ষার জন্য মানুষকে দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত, তাহা না হইলে অনাহারে অথবা অধিক দৈহিক শক্তিশালী জন্তুদের উপদ্রবে মানুষ জাতি টিকিয়া থাকিতে পারিত না। প্রথম হইতে মানুষেরা নানারকম হাতিয়ার প্রস্তুত করিতে শেখে; ফ্রাঙ্ক্‌লিন বলিয়াছেন যে, মানুষের প্রথম বিশেষত্বই হইল হাতিয়ার গড়িবার কৌশল আয়ত্ত করা। এই

হাতিয়ারগুলি মানুষের আদিম জীবনের প্রকৃতির সন্ধান আমাদের কাছে আনিয়া দেয়। বিভিন্ন রকম হাতিয়ারের ব্যবহার হইতে পণ্ডিতেরা অতি প্রাচীনকালের সমাজে ক্রমবিকাশের ধারা বাহির করিয়াছেন। আদিম জীবনযাত্রার ছবি আমরা আর-এক উপায়েও বুঝিতে পারি। অনেক দেশে এখনো পর্যন্ত ছোটো অসংখ্য উপজাতির অস্তিত্ব আছে, তাহাদের জীবনযাত্রার ধরন এখনো সেকালের অবস্থা হইতে বেশি অগ্রসর হইতে পারে নাই। নৃতত্ত্ববিদেরা ইহাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা মানুষের শৈশবকালের কথা অনেকখানি বুঝিতে পারি। পুরাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব—বিজ্ঞানের এই দুই বিভাগের আলোচনায় মানুষের প্রাচীনতম সমাজের প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া যায়।

এই আদিম সমাজের প্রধান কথা, এখানে শ্রেণী-বিভাগ নাই। উৎপাদনের উপাদানগুলি তখন সাধারণের সম্পত্তি, তাহাতে ব্যক্তিগত বিশেষ অধিকার তখনো আসে নাই। এক-একটি মূল দল তখন খাদ্যসংগ্রহ করিত সকলের মিলিত পরিশ্রমে, আর সকলে মিলিয়া উপভোগ করিবার রীতিই ছিল প্রচলিত। অতিবৃদ্ধ, রুগ্ন বা শিশুদের অবশ্য সব সমাজেই অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়, কিন্তু আসল প্রাক্-সভ্য সমাজে অপর কাহারো অন্যের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার উপায় থাকে না। তাই সেখানে আমরা ধনী বা নির্ধন, মালিক বা দাস—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্তরের লোক দেখি না। প্রাচীন সমাজকে তাই আদিম সমসমাজ বা শ্রেণীহীন সমাজ বলা চলে, সেখানে এক শ্রেণীর দ্বারা অন্য শ্রেণীর শোষণ ছিল না। মানুষের ইতিহাসে প্রথম সমাজের গড়ন ছিল এইরকমের।

প্রাক্-সভ্য সমাজে ঠিক একই অঞ্চলে মানুষের বহুদিন আবদ্ধ থাকিবার উপায় ছিল না, খাদ্যসংগ্রহের চেষ্টায় তাহাদের ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। কিন্তু ক্রমে মানুষ কৃষিকার্যের সাহায্যে কোনো কোনো বিশেষ দেশে স্থির হইয়া বসিতে পারিল ; এইভাবে আসিল সমাজের চেহারার বদল এবং সভ্যতার আরম্ভ। প্রাক্-সভ্য সমাজে সকলে মিলিয়া পরিশ্রম করিলেও, যত প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ হইত তাহার মোট পরিমাণ থাকিত সামান্য, তখন সকলেই ছিল গরীব। চাষের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উর্বর দেশে, বিশেষত এশিয়া ও আফ্রিকার প্রকাণ্ড নদীগুলির ধারে নূতন সমাজ দেখা দিতে লাগিল,

যেখানে উৎপাদনের উন্নতির ফলে ধনসঞ্চয়ের সূত্রপাত হইল। এই ভাবে প্রথম সভ্য সমাজের উৎপত্তি হয়। জীবনযাত্রার নূতন যে-ধরন এবার গড়িয়া উঠিল তাহার প্রথম প্রকাশকে প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্য সমাজ অথবা এশিয়াটিক সমাজ বলা চলে।

ইজিপ্টের নীল নদ, ইরাক অঞ্চলে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস, চীনদেশে হোয়াংহো ও ইয়াং-সিকিয়াং, ভারতে সিন্ধু ও গঙ্গা—এই-সব নদীর ধারে ধারে এইভাবে প্রথম সভ্য সমাজ দেখা গেল, সেখানে মানুষের জীবনযাত্রা আর অসভ্যদের মতন অস্থির বা অসচ্ছল নয়, উৎপাদনের প্রকৃতিরও সেখানে পরিবর্তন আসিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া ইহার আর্থিক গড়ন মোটামুটি একরকম থাকিয়া যায়। প্রাচ্যদেশে পরিবর্তন নাই—এই ধারণার উৎপত্তির কারণ, এখানে উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যে বহুদিন বেশি-কিছু বদল আসে নাই, আর্থিক বন্দোবস্ত একইভাবে দীর্ঘকাল চলিতে থাকে। সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য গঠিত ও ধ্বংস হইল, যুদ্ধবিগ্রহেরও অভাব ছিল না, এক শাসকের পর অন্য শাসক আসে, সভ্যতার নানা বিদ্যার চর্চা হয়, কিন্তু গ্রাম ও জনপদগুলির সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রা মোটের উপর একই রকম থাকিয়া যাওয়াতে এশিয়াটিক সমাজে একটা স্থবির ভাব দেখা যায়। সমস্ত সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবনে সমগ্র ক্রমবিকাশের ধারা বা ব্যাপক প্রগতির স্রোত তাই এখানে স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই।

অবশ্য এই বিচার আপেক্ষিক মাত্র। এ কথা ভাবা অন্যায় যে পরিবর্তনের ধারা প্রাচ্যে অনুপস্থিত ছিল। বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রাচ্যদেশেও সমাজবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব নয়। তবে পশ্চিমী ধরনের সমাজবিপ্লব এখানে বহু শতাব্দীর মধ্যে চোখে পড়ে না। অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে প্রাচীন ও প্রাচ্য সমাজের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, তবুও মোটের উপর এশিয়াটিক সভ্যতার ব্যাপক রূপটি ছিল স্থিতিশীল।

প্রাচীন প্রাচ্যে সভ্যতার সামাজিক ইতিহাস আমাদের কাছে এখনো অনেকখানি আবছায়ায় রহিয়া গিয়াছে, তাই মার্কসবাদী মহলে এই সম্পর্কে মতবিরোধ থাকাটা আশ্চর্য নয়। অনেকের মতে আদি সভ্যতার উদয় হইতে এই সেদিন পর্যন্ত এশিয়াটিক সমাজের গড়ন মোটামুটি একই রকম থাকিয়া গিয়াছে, আধুনিক ইওরোপের

সংঘাতেই আসিয়াছে প্রথম প্রকৃত পরিবর্তন। এই প্রাচীন সমাজকে অনেক সময় এশিয়াটিক সামন্ত সমাজ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এই বিশ্বাসে যে, পরিচিত পরবর্তী সামন্ত-প্রথার সঙ্গে ইহার কিছু মিল আছে। অন্যদের ধারণা যে প্রাচীন প্রাচ্য ইতিহাসেও এক ধরনের সমাজবিপ্লব ছিল, ক্রমবিকাশ ইওরোপের মতন এখানেও পর পর বিভিন্ন সমাজ সৃষ্টি করে। এই মতানুসারে এশিয়াটিক সমাজও আসলে পরবর্তী ইওরোপের মতন প্রথমে দাস-সমাজ, পরে সামন্ত-সমাজের রূপ গ্রহণ গ্রহণ করিয়াছিল, এমন-কি আধুনিক ইওরোপের ধাক্কার আগেই এই-সব অঞ্চলে স্বদেশী ধনতান্ত্রিক সমাজের গোড়া-পত্তনও হয়তো লক্ষ্য করা অসম্ভব নয়।

প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতার স্বরূপ নির্ধারণ ও পর্যায়ক্রম বিচার তাই এখনো ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। তবু মোটের উপর পশ্চিমের তুলনায় এশিয়ার সমাজব্যবস্থা অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। দীর্ঘস্থায়িত্বকে অনেকে, বিশেষত সনাতনপন্থীরা, গৌরবের কথা মনে করে : কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে প্রাচ্যসভ্যতার চাইতে অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী সমাজের কথা আমরা জানি—সে-সমাজ হইল প্রাচীনতর অসভ্য সমাজ। প্রাচ্য সমাজের দুর্বলতা আজ ঢাকা পড়ে না, প্রাচীনকালের মোহ বাস্তব অবস্থার চাপে এখন দ্রুতবেগে কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আদিম প্রাক্‌ সভ্য যুগের পর মানুষের সভ্যতার প্রথম স্তর এই এশিয়াটিক সমাজ, তবে এটা শুধু তারিখের বিচার। অসভ্য সমাজ খণ্ড খণ্ড ভাবে পৃথিবীর অনেক দেশেই আজ পর্যন্ত থাকিয়া গিয়াছে, আমাদের দেশে পাহাড় অঞ্চলে এখনো তাহার চিহ্ন দেখি। কলম্বাসের পর যখন আমেরিকা আবিষ্কৃত হইল, তখন সেখানে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আদিম শ্রেণীহীন সমাজই দেখা গিয়াছিল।

অবশ্য, সেখানেও মাঝে মাঝে প্রাচীন প্রাচ্যের অনুরূপ সভ্য সমাজ ছিল, যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় আজটেক ও ইন্‌কাদের মধ্যে। বলা বাহুল্য, এশিয়াটিক সমাজেই প্রথম শ্রেণীভেদ আত্মপ্রকাশ করে। নূতন ধরনের উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রাচ্যে ধনসঞ্চয় সম্ভব হইল, সমাজে এমন শ্রেণী দেখা দিল যাহাদের খাওয়া-পরার জন্য নিজেদের পরিশ্রম না করিয়াও অন্যের পরিশ্রমের ফলভোগ করিয়া দিন স্বচ্ছন্দে কাটিতে পারে। জমি প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদানগুলি এখন আর

কার্যত সাধারণের সম্পত্তি নয়, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা-সুলভ অধিকার জন্মিয়াছে। প্রয়োজনীয় সকল জিনিস এখন আর অসভ্যদের মতন সকলের কাজে আসে না, তাহাতে ভোগের অধিকারভেদ আসিয়াছে। ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্র দেখা গেল, সম্পত্তিবানেরা বিত্তহীনদের উপর শোষণ-প্রথার প্রবর্তন করিল। সমাজে শ্রেণীভেদের উদয় হওয়াতে স্বভাবতই একশ্রেণীর সহিত অন্য শ্রেণীর দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। তখন আবশ্যক হইল শাসকশ্রেণীর, নহিলে সমাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। উৎপাদনের উপাদানগুলি যাহাদের আয়ত্তে আসিয়া পড়ে তাহারাই তখন শাসকশ্রেণীতে পরিণত হয়। অসভ্য সমাজে স্টেট বা রাষ্ট্রের কোনো গঠিত রূপ পাওয়া যায় না, এশিয়াটিক সমাজে নূতন সংগঠন প্রথম দেখা দিল। এতদিনে সমাজে রাজা, অমাত্য প্রভৃতির আবির্ভাব হইল ; সাধারণ লোককে সমাজের শাসনে বাঁধিয়া রাখার জন্যই পুরোহিতশ্রেণী ও সংগঠিত ধর্মেরও আরম্ভ। অবশ্য অসভ্যদের মধ্যেও এই-সব পরিবর্তনের সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। তবুও শ্রেণীভেদ ও শোষণের ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি সভ্যতারই প্রথম বৈশিষ্ট্য। এই বনিয়াদকে আশ্রয় করিয়া সভ্যতার উপরের চাকচিক্য বিকাশ লাভ করে ; ক্রমে ক্রমে সাহিত্য, শিল্পকলা, চিন্তা, জ্ঞানচর্চা প্রভৃতি সামাজিক জীবনের নানা অঙ্গের উন্মেষ হয়। লিখিত ইতিহাসের আরম্ভ এইখানে।

অসভ্য আমলের অবসানে ইওরোপেও সভ্যসমাজ গড়িয়া উঠিতে থাকে ধীরে ধীরে। শ্রেণীভেদ, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, সংস্কৃতির বিকাশ ছিল তাহারও অঙ্গ। কিন্তু গ্রীসদেশ, এবং পরে রোমের বিস্তীর্ণ রাজ্যে ক্রমে দাস-প্রথা হইয়া পড়ে উৎপাদনের প্রধান আশ্রয়। ইওরোপে প্রথম সভ্য সমাজের বিকাশ ও বিস্তারের মূলে ছিল দাস-দের পরিশ্রম, সেই পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করিয়াই প্রাচীন ইওরোপের মালিকশ্রেণী তাহাদের সুবিখ্যাত সভ্যতা গড়িয়া তোলে। এশিয়াটিক সমাজের মতন ইওরোপের দাস-সমাজেও শ্রেণীভেদ ও শোষণ-প্রথার আধিপত্য দেখি ; সেখানেও রাষ্ট্রশক্তি আর শাসন-পদ্ধতি, ধনসঞ্চয় আর সংস্কৃতি—এক কথায় সভ্যতার সকল লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। তফাতের মধ্যে এই যে দাস সমাজে, শুধু যে উৎ-পাদনের উপাদানগুলি অভিজাত-শ্রেণীর হাতের মুঠোর মধ্যে তাহা

নয়, তাহাদের দৈহিক পরিশ্রমে সমস্ত সমাজের খাওয়া-পরা চলিতে লাগিল তাহাদের মধ্যে বহু লোকই এখানে প্রভুদের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইল। ক্রীতদাসেরা এখানে গোরুমহিষের শামিল; তাহাদের কেনাবেচা চলে, তাহাদের সমস্ত সময় প্রভুদের হাতে, তাহাদের জীবন মরণও নির্ভর করে প্রভুদের মর্জির উপর। গ্রীস ও রোমে নিশ্চয় স্বাধীন লোকেরও অস্তিত্ব ছিল কিন্তু ধন উৎপাদনের অনেকখানিই অসংখ্য ক্রীতদাসদের পরিশ্রমে চলিত বলিয়া এখানকার প্রাচীন সমাজকে দাস সমাজ বলা অন্যায় নয়। পৃথিবীর অন্য কোনো দাস সমাজ নয় শুধু গ্রীস ও রোমের দাস সমাজ সব চাইতে সুবিখ্যাত।

দাস প্রথার উদ্ভবের মূলে আর্থিক কারণ রহিয়াছে। ইওরোপের যে অঞ্চলে প্রথম সভ্যতা ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, সেখানে এশিয়াটিক সমাজের জন্মভূমিগুলির মতো নদীবহুল উর্বর প্রদেশ ছিল না। অল্প পরিশ্রমে প্রচুর ধন উৎপাদন সেখানে সম্ভব হয় নাই, তাই সেখানে লোককে দাস করিয়া খাটাইতে না পারিলে সেখানে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন সহজ ছিল না। ধাতুর আবিষ্কারের পর প্রাচীন অধিবাসীগুলির অনেক বদল হয়, যাহাদের হাতে ধাতু শক্তিশালী অস্ত্রের সমাবেশ। পরাজিত ও অনুন্নত জাতিদের অনেককে দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া সম্পত্তিবানেরা তখন নূতন সমাজ গড়িয়া তোলে। সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীস রোমে ধারণা দাঁড়াইল যে সম্পত্তিবানেরাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী, আরামের পথে উপর তাহাদেরই প্রাপ্য। তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দৈনন্দিন শারীরিক পরিশ্রমের দায়িত্ব দাস ও দাসদের নানা বিধি। এখানে এশিয়াটিক সমাজের মত দাস সমাজেও ক্ষমতা আসলে তাহার শুধু ভিন্ন ধরনে ও প্রচণ্ডরূপে। গ্রীস ও রোমের সংস্কৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ কিন্তু প্রাচীন গ্রীস সভ্যতার ঐশ্বর্যের ভিত্তিমূলে রহিয়াছে দাস ও পরাধীন অন্য জাতির শ্রম ও পরিশ্রম।

প্রাচীন গ্রীসে দাসদের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ছিল, সেখানে অনেক কীর্তি দাসদের পরিশ্রমে গঠিত। কিন্তু মূল উৎপাদন অর্থাৎ কৃষি ও প্রাথমিক শিল্পের কাজে দাসেরা কতখানি নিযুক্ত হইত তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া যায়। পণ্ডিতে দাস সমাজ তাই ইতিহাসে গ্রীস রোমের সঙ্গেই বিশেষভাবে জড়িত।

রোম-সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দাস-প্রথা ইওরোপের অনেকাংশে ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে-সমাজেরও ভাঙন আরম্ভ হইল। রোমান আমলের শেষের দিকে ক্রমে ক্রমে দাসত্ব প্রথা অচল হইতে থাকে। তখন দেখা যায়, জমিদারেরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে নূতন আর্থিক বন্দোবস্ত আরম্ভ করিতেছে, অরাজকতার দিনে সাধারণ লোকদের রক্ষা করিবার দায়িত্ব জমিদারেরা লইতেছে, আর চাষীরা সাক্ষাৎ প্রজা হইয়া জমিদারকে খাদ্য জোগাইতেছে, অথবা খাস জমি চাষ করিয়া দিতেছে।

রোম-সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া টিউটনেরা ইওরোপের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। তাহারা এতদিন আদিম অসভ্য শ্রেণীহীন সমাজের লোক ছিল, এখন তাহাদের মধ্যেও সভ্যতা দেখা দিয়াছে। ধ্বংসোন্মুখ রোমান দাস সমাজ ও উদীয়মান টিউটন বা জার্মানিক সভ্যসমাজের মিশ্রণে ইওরোপে পরবর্তী বিভিন্ন জাতি গঠিত হয়। ভাঙা-গড়ার দীর্ঘ বিশৃঙ্খল পর্ব শেষ হইলে ইওরোপে যে আর্থিক গড়ন প্রকাশ পাইল ইতিহাসে তাহার নাম ফিউডাল ব্যবস্থা বা ইওরোপীয় সামন্তপ্রথা। ইওরোপের সমস্ত মধ্যযুগ জুড়িয়া সভ্যতার এই এক নূতন প্রকাশের আমরা পরিচয় পাই, ইহাকে মানুষের ইতিহাসে পরিণত সামন্ততন্ত্র বা প্রকৃত ফিউডাল সমাজ বলা চলে। অবশ্য অনেকাংশে স্বতন্ত্র, কিছু অনুরূপ সামন্তপ্রথার অস্তিত্ব প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্য সমাজেও দেখা গিয়াছিল।

সভ্যতার অন্যান্য স্তরের মতন ফিউডাল আমলেও শ্রেণীভেদ ও শোষণ-প্রথার উপর সমস্ত সমাজ নির্ভর করিত। তবে ফিউডাল পদ্ধতির মূল বিশেষত্ব এই যে, সম্পত্তিবান সামন্তেরা উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিক হইলেও, সাধারণ লোকে আর ঠিক পুরাপুরি দাস নহে; তাহাদের উপর সম্পত্তির দাবি আর আইনত প্রভুদের হাতে নাই, এমন-কি উৎপাদনের যন্ত্র আর উপাদানের উপর সাধারণ লোকের কিছু কিছু অধিকার আছে। চাষীরা দাসদের মতন প্রভুর খাস সম্পত্তি নয়, কিন্তু তাহাদিগকে বেগার খাটিয়া প্রভুর নিজস্ব জমি চাষ করিয়া দিতে হইত; অথবা নিজেদের উৎপন্ন জিনিসের একটা মোটা অংশ বিনা মূল্যে মালিকের হাতে তুলিয়া দিয়া মালিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার রসদ জোগাইয়া চলিতে চাষীরা বাধ্য থাকিত। ইহার বদলে চাষীদের ভাগ্যে জুটিত ছোটো ছোটো জমির টুকরা নিজেদের সাধ্যমতো ভোগ করিবার সামান্য অধিকারটুকু, সেখানে চাষ করিয়া

তাহাদের নিজেদের ভরণপোষণ চালাইতে হইত। ক্রীতদাসের খাওয়া পরা জোগানোর দায়িত্ব ছিল প্রভুদের, এখন আর প্রভুদের সে-ভাবনা রহিল না। ফিউডাল যুগে অনেক সময় সাধারণ নিয়ম ছিল যে, চাষীদের সপ্তাহে অর্ধেক সময় মালিকের জমিতে হাজির থাকিয়া প্রভুর কর্মচারীদের হুকুম তামিল করিতে হইবে। তখন সামন্তদের নিজস্ব জমিজমার চাষ কৃষকদের বেগার খাটাব ভিতর দিয়া সম্পন্ন হইত, শোষণ-প্রথার নূতন রূপ এইখানে দেখা যায়।

কৃষির কাজ ফিউডাল সমাজের প্রধান উপজীবিকা হইলেও, সে-যুগে নানাপ্রকার জিনিস কারিগরেরা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। ইওরোপীয় মধ্যযুগে শহরগুলিতে এই ধরনের কাজের বিস্তর প্রচলন ছিল। কারুশিল্প অথবা কারিগরদের হাতের কাজ এশিয়াটিক ও দাস-সমাজেও প্রচলিত ছিল; তবে ফিউডাল যুগে তাহার আবার বিস্তৃত প্রচলন হয় বহুদিনের পর, আর ক্রমে ক্রমে বড়োলোকদের বিলাসের জিনিস ছাড়াও সাধারণের উপযোগী অনেক জিনিস এই ভাবে প্রস্তুত হইতে থাকে। প্রাচীন প্রাচ্য সমাজে অনেক সময় কারিগরেরা গ্রামের গোষ্ঠীর ভিতরেই থাকিত, কিন্তু ফিউডাল মধ্যযুগে তাহাদের প্রধান আস্তানা ছোটো ছোটো অসংখ্য শহরগুলিতে। চাষীর যেমন নিজস্ব জমি, লাঙল, গোরু ইত্যাদি উৎপাদনের উপাদান ছিল, কারিগরদেরও তেমনি নিজ নিজ যন্ত্রপাতি ও হাতের কাজের অন্যান্য উপকরণ রাখিতে হইত।

ফিউডাল কারিগরেরা কিন্তু ঠিক স্বাধীন নয়, তাহাদের নির্ভর করিতে হইত প্রথমে সামন্ত প্রভু, পরে কারিগরী সঙ্ঘের কর্তা-ব্যক্তিদের উপর। ফিউডাল আমলে উৎপাদনের উপাদানগুলির অধিকাংশ মালিকশ্রেণীর বড়ো বড়ো সম্পত্তির আকার লইলেও, তাহার ছায়ায় ছায়ায় চাষী ও কারিগরদের ছোটো ছোটো সম্পত্তিও দেখা যায়। অথচ সমস্ত সমাজের গড়ন নিয়ন্ত্রণ করিত সামন্তদের সম্পত্তি ও প্রভাব। ফিউডাল ব্যবস্থার স্বর্ণযুগে আর-একটি বিশেষত্ব এই যে, চাষীরা অর্থাৎ দেশের প্রায় সমস্ত সাধারণ লোক, ঠিক দাস না হইলেও তাহাদের অনেক সময় প্রভুর অনুমতি ব্যতীত গ্রাম ছাড়িবার উপায় ছিল না। এই চাষীদের সার্ফ বলা হইত; সার্ফ-প্রথায় দাসত্বের অনেকখানি আমেজ থাকায় আমরা ইহাদের ভূমিদাস কিংবা অর্ধদাস বলিতে পারি।

ফিউডাল বিধিব্যবস্থা পূর্ব ইওরোপে এই সেদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল ; প্রাশিয়ায় সার্ফদের মুক্তি আসে নেপোলিয়ানের আমলে, আর রুশদেশে তাহারও পরে, ১৮৬১ সালে। কিন্তু পশ্চিম ইওরোপে ইহার অনেক আগেই, অর্থাৎ চৌদ্দ হইতে সতেরো শতকে, ফিউডাল সমাজ রূপান্তর গ্রহণ করে। ফিউডাল প্রভাব ও সে-যুগের নানা ব্যবস্থা ও ধারণা ফরাসী বিপ্লব ও তাহার ঠিক পরের আমল পর্যন্ত টিকিয়া গেলেও, মধ্যযুগের শেষের দিকে এবং আধুনিক ইওরোপের ইতিহাসের গোড়াতে ধনোৎপাদনের বন্দোবস্তে বিস্তর পরিবর্তন শুরু হয়।

এই যুগে একদিকে চোখে পড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তার ; অন্যদিকে পশ্চিমে চাষের কাজ ও কারিগরদের হাতের কাজেও বিস্তর বদল আসিল। ফিউডাল কৃষি ও ফিউডাল শিল্পে এই পরিবর্তন আমরা প্রধানত দেখিতে পাই ইটালি, পশ্চিম জার্মানি, উত্তর ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডে। পশ্চিম দেশগুলিতে ফিউডাল সমাজের অন্যতম সুপরিচিত বিশেষত্ব সার্ফ-প্রথার অবসান ঘটিল ; জমিদারেরা চাষীর বেগার খাটার উপর নির্ভর না করিয়া চাষের উন্নততর উপায় অবলম্বন করিতে থাকে ; চাষীদের মধ্যে অবস্থাপন্ন বড়ো কৃষক ও গরীব সামান্য চাষীর তফাত স্পষ্টতর হইতে লাগিল। ইংল্যাণ্ডে অনেক অঞ্চলে জমিতে চাষের বদলে ভেড়া চরাইবার ব্যবস্থা হয়, তাহাতে প্রভুদের তখন বেশি লাভের সম্ভাবনা।

স্বভাবতই তখন অনেক চাষী জমি হইতে উৎখাত হইতে থাকে। অন্যদিকে কারিগরদের হাতের কাজে রূপান্তর আসিল শ্রমবিভাগের মধ্য দিয়া। গোটা জিনিসটা একজনে প্রস্তুত না করিয়া, তৈয়ারি করিবার পদ্ধতিটা যদি ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করা যায়, আর সেই এক-এক ধরনের কাজ যদি আলাদা কারিগরের হাতে থাকে, তাহা হইলে শিল্পের মধ্যে শ্রমবিভাগ আসিল বলা যায়। ইহাতে কারিগরেরা নিজের নিজের বিশেষ কাজে দক্ষ হইয়া পড়ে, আর সেই কাজে ক্রমশ বেশি উপযুক্ত উন্নত হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়। কাপড়, গাড়ি, ঘড়ি প্রভৃতি তৈয়ারি করিবার প্রণালীকে এইভাবে অসংখ্য খণ্ড খণ্ড কাজে ভাগ করা হইয়াছিল। ইহার ফলে অনেক জিনিস আরো তাড়াতাড়ি আর ভালোভাবে করিবার উপায় আসিল বটে, কিন্তু কারিগরেরা ক্রমেই অন্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতে লাগিল। তাহাদের কোন্ কাজ কতখানি করিতে হইবে তাহা

আর স্ববশে রহিল না, সে-সব কথা ঠিক করিতে লাগিল অন্যেরা—কারিগরেরা হুকুম মানিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করে এইভাবে। সেই হুকুম আসিতে লাগিল ব্যবসায়ী বণিকদের কাছ হইতে; কারিগরেরা বণিকদের ফরমাশ অনুসারে নানারকমের কাজে নিযুক্ত হইল। মধ্যযুগের শেষের এই বণিকেরা আজকালকার ধনিকশ্রেণীর পূর্বগামী। কিন্তু তখন পর্যন্ত কাজের হাতিয়ার আর যন্ত্রগুলি কারিগরদেরই নিজস্ব সম্পত্তি; তাহারা নিজেদের বাড়িতে বসিয়াই কাজ করিত।

চাষের ধরন আর হাতের কাজে বদলের মধ্য দিয়া ফিউডাল আমলের যে-রূপান্তর দেখা গেল, তাহার মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার জিনিস আদান-প্রদানের বিস্তার; মানুষের আর্থিক জীবনে এখন পণ্যদ্রব্য বিনিময় ক্রমশই ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। পণ্যবিক্রয় আগেকার সভ্যসমাজেও চোখে পড়ে, কিন্তু তাহার পরিধি ছিল সংকীর্ণ। আসল ফিউডাল আমলে বাজার ছিল অপেক্ষাকৃত নগণ্য ব্যাপার, সেখানে স্থানীয় জিনিসেরই বেচাকেনা চলিত, তাহার পরিমাণও ছিল সামান্য। মেলায় লেনদেন ছিল সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। এখন বণিকদের কল্যাণে স্থায়ী বাজারের ব্যাপ্তি দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সমাজের বিপুলাংশ তাহার প্রভাবের আওতায় আসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। পনেরো-ষোলো শতকের নূতন নূতন জলপথ আর সাগরপারের নূতন দেশ আবিষ্কার পশ্চিম ইওরোপবাসীদের পক্ষে জগৎজোড়া বাণিজ্যের সূত্রপাত করে।

নিজে ব্যবহার না করিয়া শুধু বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত জিনিসের নাম পণ্যদ্রব্য (commodity)। ফিউডাল মধ্যযুগে প্রথম দিকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য, বিচ্ছিন্ন লোকালয়গুলিকে সাধারণত নিজেদের স্থানীয় উৎপন্ন মাল লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত; শেষের দিকে পণ্যদ্রব্যের প্রচলন বাড়িয়া চলিল। বাজার বিস্তার লাভ করায় আর্থিক জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্যের তখন ক্রমান্বয়ে শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। এই বণিক-প্রাধান্যের দিনে আবার প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয় (primitive accumulation of capital) সবেগে চলিতেছিল, পরবর্তী ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রথা গড়িয়া উঠিবার উপায় দেখিতে পাই এই মূলধন জোগাড়ের মধ্য দিয়া। গ্রাম হইতে অসংখ্য

ছোটো চাষীর উচ্ছেদ, জমিদার ও অবস্থাপন্ন কৃষকদের জমির উপর দখলের বিস্তারলাভ, কারিগরদের ধীরে ধীরে বণিকদের আশ্রিত হইয়া পড়া, কারুশিল্পের মধ্যে শ্রমভেদের বিকাশ, ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার, অনুন্নত ও নব-আবিষ্কৃত দেশে লুটপাট—এই-সবের ভিতর দিয়া চলিতে থাকে প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়। বলা বাহুল্য, এ-আমলে শ্রেণীভেদ ও শোষণ-প্রথার কোনো অন্যথা হয় নাই, বিরোধ ও শোষণ এমন-কি অনেক সময় হইয়া ওঠে তীব্রতর।

আঠারো ও উনিশ শতকে পশ্চিম ও মধ্য ইওরোপে ক্যাপিটালিস্ট ধনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এই পরিণত সমাজকে আমরা পূর্ণ ধনতন্ত্র হিসাবে ধরিতে পারি। ইহার প্রভাব ক্রমে সারা পৃথিবী গ্রাস করিল, পূর্ব ইওরোপের ফিউডাল সমাজ ও প্রাচ্যদেশের এশিয়াটিক সমাজ ইহারই তাড়নায় এতকাল পরে রূপান্তরিত হইতে লাগিল। পূর্ণ ধনিকতন্ত্রে উৎপাদন-রীতির প্রধান বিশেষত্ব দুইটি। একদিকে উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলি প্রায় সমস্তই ধনিক শ্রেণীর নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া পড়ে, জমিদার, অবস্থাপন্ন কৃষক, বণিক, সকলেই এখন ধনিকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; ধনিকদের পুঁজি বাড়িয়াই চলিতেছে। অন্যদিকে সাধারণ লোকের হাতে আর উৎপাদনের কোনো উপাদানই থাকে না; কাজেই খাওয়া-পরার জন্য তাহাদের মালিকদের অধীনে কাজ করা ভিন্ন গতি নাই। একদিকে সঞ্চিত মূলধন ও উৎপাদনের সমস্ত উপাদানগুলি; অন্যদিকে সবপ্রকার বিত্তে বঞ্চিত সাধারণ নিঃস্ব লোক যাহাদের একমাত্র সম্বল এখন খাটিবার শক্তি। এই উভয়ের সংযোগে ধনতন্ত্র গড়িয়া উঠিল। সাধারণ লোক এখন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিজেদের শ্রমশক্তি মালিকদের কাছে বিক্রয় করে, তাহার পরিবর্তে তাহাদের খাওয়া-পরা না চলিয়াও চলে। মজুরের খাটিবার ক্ষমতা কিনিয়া লইয়া প্রভুরা নিজেদের কাজে লাগায়; তাহাদের পরিশ্রমে উৎপন্ন সমস্ত জিনিস পণ্য হিসাবে এখন মালিকদেরই সম্পত্তি; সেই জিনিস বাজারে বেচিয়া ধনিক মজুরির মূল্য তো ফিরাইয়া পায়ই, তাহা ছাড়া তাহাদের বিস্তর লাভও থাকিয়া যায়। লাভের খানিকটা ধনিকেরা নিজেদের ভোগে লাগায়, কিন্তু তাহার অনেকাংশ নূতন পুঁজি বা মূলধনে পরিণত হয়, তাহা হইতে আবার নূতন লাভের সম্ভাবনা আসে।

নিজের সামান্য জমির চাষে নিযুক্ত কৃষক, কিংবা ছোটো ব্যবসায়ী আর স্বাধীন কারিগর যে ধনতান্ত্রিক দেশে একেবারে লোপ পায় তাহা নহে। কিন্তু তাহাদের দুর্দশার আর অন্ত থাকে না, তাহাদের অবস্থা অনেক সময় খেতমজুর বা কারখানার শ্রমিকদের চাইতেও অধম হইয়া পড়ে। মালিকদের অধীনে মজুরের পরিশ্রম এখন উৎপাদনের প্রধান রীতি হইয়া দাঁড়ায়। এই ক্যাপিটালিস্ট অথবা ধনিক-সমাজ এখনো পৃথিবীর অধিকাংশে কর্তৃত্ব করিতেছে।

স্পষ্টই দেখা যায় যে, এখানেও শ্রেণীভেদ আর শোষণের মূল প্রথার বিন্দুমাত্র অবসান হয় নাই; আধুনিক উন্নত ধনিক সমাজে তাহার শুধু প্রকারান্তর ঘটিয়াছে। ফিউডাল আমলে অধিকাংশ লোক সার্ফ ছিল, আইনের চোখে তাহাদের অবস্থা ছিল অর্ধদাসত্বের শামিল, এখন তাহারা হইয়াছে আইনত স্বাধীন। অনেক ঐতিহাসিক সাধারণ লোকের এই মুক্তিকে খুব বড়ো করিয়া দেখেন। চোখে অঙুল দিয়া মার্কস দেখাইলেন যে, এই মুক্তি হইতেছে আসলে উৎপাদনের উপায়গুলি স্ববশে রাখিবার অধিকার হইতে 'মুক্তি'। ব্যক্তিগত দাসত্ব হইতে সাধারণ লোকে আসিয়া পড়িয়াছে মজুরির দাসত্বের মধ্যে। সমাজের নূতন আর্থিক গড়নে প্রথম বিশেষত্ব এখন এই মজুর শ্রেণী। আগের দিনেও সমাজে কিছু কিছু মজুর থাকিত বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য, উৎপাদনের আর্থিক ব্যবস্থায় তাহাদের অংশও ছিল সামান্য। এখন মজুরের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলে, সমাজের প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদনে মজুরি প্রথাই প্রধান অবলম্বন হইয়া দাঁড়ায়। বর্তমান সমাজের গড়নে দ্বিতীয় বিশেষ ধনিকশ্রেণী, যাহাদের হাতে মূলধন আসিয়া সঞ্চিত হয়। এই ধনিকশ্রেণী আগেকার দিনের সামন্তশ্রেণীর মালিকদের হইতে স্বতন্ত্র।

প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ের যুগে যখন ধনিকেরা প্রথম দেখা দিতে লাগিল, তখন তাহারা ব্যবসায়ী বণিকদের পার্শ্বচর; সেই বণিকদের প্রধান আস্তানা ছিল শহরগুলিতে, আর সেই শহরের ফরাসী নাম হইতে এই শ্রেণীর নাম হইল বুর্জোয়া। সামাজিক মর্যাদায় তাহাদের স্থান তখন অভিজাত ভূস্বামী আর সাধারণ লোকের মাঝামাঝি; তাই ইংরাজিতে ইহাদের নাম দেওয়া হয় মধ্যশ্রেণী। ধনিকদের এখনো অনেক সময় মধ্যশ্রেণী হইতে উদ্ভূত বুর্জোয়া নামেই অভিহিত করা

হয়। বর্তমান সমাজে এখনো অনেক শ্রেণী আছে, কিন্তু আসল কর্তৃত্ব এখন ধনিকদের হাতে, আর মজুরেরাই দিন দিন উৎপাদন-রীতির প্রধান অবলম্বন হইয়া পড়িতেছে। ধনতান্ত্রিক প্রথাই এখন সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

সামাজিক ক্রমবিকাশের কথা বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা যে একেবারে অস্বীকার করেন তাহা নহে; সেকালের বিভিন্ন সমাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান আমরা তাঁহাদের লেখা হইতেই সংগ্রহ করি। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একটা সাধারণ বিশ্বাস দেখিতে পাই যে, পরিবর্তনের স্রোত ধনতন্ত্রে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে, আজকের দিনের সমাজই যেন প্রাচীনকালের স্বাভাবিক ও শেষ পরিণতি। মার্কস প্রথম আমাদের শিখাইলেন যে, সমাজের মধ্যে আথিক বিরোধ থাকার জন্যই শ্রেণীসংগ্রামের ভিতর দিয়া পুরাতন ব্যবস্থার অবসান আসে এবং নূতন আথিক বন্দোবস্তের উপর নূতন সমাজ গড়িয়া ওঠে। তিনি দেখাইলেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজেও সেই বিরোধ পূর্ণ-মাত্রায় থাকিয়া গিয়াছে; সুতরাং সেই সমাজের পতন ও সামাজিক জীবনের পুনর্গঠন অবশ্যম্ভাবী।

মার্কস ও এঙ্গেলস-এর মৃত্যুর পর তাঁহাদের বিশ্লেষণ সফল হইয়া ওঠে রুশ দেশে; বল্‌শেভিক নেতৃত্বে সেখানে পুরাতন আথিক ব্যবস্থার রূপান্তর হইয়া সত্য সত্যই নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই নূতন ব্যবস্থার আভাস মার্কস পাইয়াছিলেন, ইহার নাম সোশ্যা-লিজম অথবা সমাজতন্ত্র। আজ পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগের এক ভাগে নূতন সমাজ জয়যুক্ত হইয়াছে, অন্য ভাগগুলিতে প্রগতিবাদীরা এই ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য আজ উন্মুখ। ইহাকে আমরা ইতিহাসে আজকের দিনের আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইব। ইহার প্রতিষ্ঠাই সাম্যবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

সোশালিস্ট সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে এত যুগের পর শোষণ-প্রথার অবসান হইল, শ্রেণীভেদও লোপ পাইতে বসিয়াছে। আদিম শ্রেণীহীন সমাজ শেষ হইবার পর পৃথিবীতে যত ধরনের সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, এক সোশালিস্ট সমাজ ছাড়া তাহার আর সকল-গুলির মধ্যে মিল আছে এই শোষণের মধ্যে, যুগে যুগে শুধু শোষণের প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে মাত্র। একমাত্র সোশালিস্ট দেশেই এখনো পর্যন্ত উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলিতে ব্যক্তিগত অধিকারের লোপ

দেখিতে পাই। এখানে জমি, খনিজ সম্পদ, কলকারখানা, যানবাহন, ব্যাঙ্ক, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সাধারণের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয়। উৎপাদনে মুনাফালাভের যে-প্রথা আজ অন্যত্র প্রচলিত এইখানে তাহার উচ্ছেদ হইয়াছে। শুধু মিল, ফ্যাক্টরি ইত্যাদি যে জাতির সম্পত্তি হইয়াছে তাহা নয়, দেশের অধিকাংশ জমি এখানে ঐকত্রিক চাষের মধ্যে সংযুক্ত হইয়া গ্রামের চেহারা পর্যন্ত বদলাইয়া দিয়াছে। অন্যের পরিশ্রমে মুনাফা সংগ্রহ সেখানে অসম্ভব বলিয়া শোষণের আর অস্তিত্ব নাই, সকলকেই আজ নিজের পরিশ্রমে উপার্জন করিতে হইতেছে। অথচ উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত প্রথা, যন্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি পূর্ণমাত্রায় প্রসার লাভ করার জন্য সোশালিস্ট সমাজকে আদিম শ্রেণীহীন সমাজের মতন অভাবের তাড়না সহ্য করিতে হয় না। নূতন আর্থিক ব্যবস্থায় গঠিত এই সমাজ আজ পৃথিবীর সেরা সমাজ, সকলের চোখ আজ ইহারই দিকে ফিরিয়াছে। সোভিয়েটের অনুসরণে জনগণতন্ত্রী পূর্ব ইওরোপ এবং সুবিশাল চীনদেশ ও কিউবা দ্বীপও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্র বা সোশালিজম গঠনের পথে যাত্রা শুরু করিল।

কিন্তু সোভিয়েট সমাজকেও এক হিসাবে শুধু সোশালিজম এর প্রথম স্তর বলা চলে। সোভিয়েট দেশে অন্যের পরিশ্রমের ফলভোগী শোষক শ্রেণীর উচ্ছেদ হইয়াছে, দেশের সকলেই এখন শ্রমজীবী (toilers)। কিন্তু শ্রেণীভেদের সম্পূর্ণ অবসান এখনো সেখানে সম্ভব হয় নাই; শ্রমিক ও কৃষক এখনো সেখানে স্বতন্ত্র শ্রেণী, দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের অধিকারভেদ এখনো সেখানে দেখা যায়। দেশের মধ্যে প্রতিবিপ্লবের আশঙ্কা দিন দিন মিলাইয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু বাহির হইতে বিপদ ও আক্রমণের ভয় যে কত সত্য তাহার প্রমাণ আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি। শ্রেণীসমাজের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে-রাষ্ট্রশক্তি পৃথিবীতে দেখা দেয়, অস্ত্রবলের উপর যে-শক্তি নির্ভর করে, তাহার অবসানও তাই রুশ দেশে এখনো সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সোশালিজম-এর পূর্ণ পরিণতি আর দেশবিদেশে তাহার বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরো উন্নত পর্যায়ের পরিচয় লাভ করিব, তাহাকে পূর্ণ সাম্যতন্ত্র নাম দেওয়া যায়, সেই সমাজই হইবে আসল কমিউনিস্ট সমাজ। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন সমাজতন্ত্রের প্রথম অবস্থাকে সোশালিজম আখ্যা দিয়াছিলেন, সোভিয়েট দেশে এখন সেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। উন্নততর

অবস্থাকে তাঁহারা কমিউনিজম নামে অভিহিত করেন, প্রকৃত সাম্যতন্ত্র সেই অবস্থারই নাম।

ভবিষ্যতের সেই সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইবে যে, সেখানে শ্রেণীভেদ একেবারে মিলাইয়া যাইবে, রাষ্ট্রের অস্ত্রবলের উপর নির্ভর এবং তাহার বল প্রয়োগের ব্যবস্থার আর প্রয়োজন থাকিবে না। এখনকার সোশালিস্ট সমাজে লোকে উপার্জন করে নিজ নিজ পরিশ্রমের অনুপাতে। তখন সমাজের নিয়ম হইবে যে সকলে পরিশ্রম করিবে আপনার শক্তি অনুসারে, কিন্তু ভোগের অধিকার থাকিবে আপন আপন প্রয়োজনের অনুপাতে। প্রকৃত শ্রেণীবর্জিত সাম্যতন্ত্রী সমাজ সেই ভবিষ্যতেই গড়িয়া উঠিবে, এখন আমরা তাহার সূচনামাত্র দেখিতেছি।

মানুষের ইতিহাসের ধারার এক সাধারণ ব্যাপক ধারণার পরিচয় এইভাবে আঁকা সম্ভব। বহু শতাব্দীব্যাপী মানুষের জীবনযাত্রার সংক্ষিপ্ত অথচ যথার্থ সরল ছবি আঁকিতে হইলে, ইংরাজীতে যাহাকে generalisation বলে তাহার আশ্রয় ছাড়া উপায় থাকে না। ঐতিহাসিকদের এ-সম্বন্ধে প্রগাঢ় অবজ্ঞা আছে, তাঁহারা বলিবেন এ-প্রচেষ্টা বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহকে অবহেলার শামিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কিম্বা দার্শনিক বিশ্লেষণে কোনো ব্যাপার বা প্রক্রিয়ার আসল সম্পূর্ণ প্রকৃতি বুঝিতে হইলে এই সামগ্রিক রূপনির্দেশ অথবা generalisation অপরিহার্য। প্রবাহের কোন সামান্য বিশেষ অংশ আয়ত্ত করিতে হইলে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আবশ্যক। সমগ্র দৃষ্টিতে সমস্তটা দেখিতে হইলে দেখিবার ধরনটাও অন্য রকম হইতে বাধ্য। জটিল বিষয়কে সরল করিয়া দেখিবার চেষ্টা [illegible] শুরু না করিলে জ্ঞান বাড়িতেও পারে না।

ইতিহাসে তাই বলিতে পারি যে, প্রথমে চোখে পড়ে আদিম যুগের শ্রেণীহীন প্রাক্-সভ্য সমাজ। তাহার রূপান্তর আসে প্রথম সভ্য সমাজে। এশিয়ার সভ্যতা একদিকে উদিত হয়, তাহার প্রধান প্রকাশ এশিয়াটিক সমাজে। অন্য দিকে গড়িয়া ওঠে ইওরোপের সুবিখ্যাত দাস-সমাজ। সেই দাস-সমাজ রূপান্তরিত হইয়াছিল মধ্যযুগীয় পশ্চিমী সামন্ততন্ত্রে। তারপর ধীরে ধীরে এই ফিউডাল সামন্ততন্ত্রে আবার রূপান্তর আসে, তখন গড়িয়া উঠিল ক্যাপিটালিস্ট বুর্জোয়া ধনতন্ত্র। ধনতন্ত্র পৃথিবীর সর্বত্র পুরাতন সমাজগুলির ধ্বংস-

সাধন করে, তাহার কর্তৃত্ব হয় জগৎজোড়া। কিন্তু আজ পৃথিবীর অনেক অংশে আসিয়া পড়িতেছে সমাজতন্ত্র, তাহারই পূর্ণ পরিণতি ভবিষ্যতের শ্রেণীশূন্য সাম্যতন্ত্রের আদর্শের মধ্যে।

ইতিহাসে মূলগতির আরো সংক্ষিপ্ত আরো সরল রূপনির্দেশ করিতে হইলে বলা চলে যে তাহা হইল আদিম শ্রেণীহীন প্রাক্-সভ্য সাম্যতন্ত্র হইতে সভ্য শ্রেণীসমাজে, এবং শ্রেণীসমাজ হইতে আধুনিক শ্রেণীবর্জিত সুসভ্য সাম্যতন্ত্রের দিকে।

স্বতন্ত্র সমাজের যে-টাইপ অথবা বিশিষ্ট নিদর্শনগুলির সন্ধান ইতিহাসে পাওয়া গেল, তাহাদের নাম—আদিম সমসমাজ, এশিয়ার আদি সভ্যতা, দাস-সমাজ, সামন্ত-সমাজ, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পরিণামে সাম্যতন্ত্র।

প্রত্যেকটি বিশিষ্ট সমাজ গড়িয়া উঠিতে অথবা ভাঙিয়া পড়িতে অনেকদিন সময় লাগে। ভাঙাগড়ার পর্বে আবার বিপ্লবাত্মক মুহূর্ত আর ধীরে ধীরে বদল, দুই ধরনের পরিবর্তনই লক্ষণীয়। এক সমাজ হইতে অন্য সমাজে রূপান্তরের যুগগুলি সময় অথবা তাৎপর্য কোনো-দিকেই নগণ্য নয়; কিন্তু রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে স্বতন্ত্র সমাজের নিদর্শন বলা চলে না। মৌলিক সমাজের সংখ্যা তাই উপরের কয়েকটিকেই বলিতে হইবে।

মানুষকে বাঁচিতে হইলে খাওয়া-পরা-থাকা ইত্যাদি ব্যাপারে যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস পরিশ্রম করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। ইহাকে যদি উৎপাদন বলি, তাহা হইলে আদিম অসভ্য অবস্থা হইতে অনাগত ভবিষ্যৎ উন্নত সমাজ পর্যন্ত অর্থাৎ সকল ধরনের সমাজেই উৎপাদনের কাজ (production) অপরিহার্য। উৎপাদনে সব সময়েই দুইটি অঙ্গ থাকে—উৎপাদনের উপাদান (means of production) অর্থাৎ কাঁচা মাল, জমি, সাজসরঞ্জাম, হাতিয়ার প্রভৃতি—এবং মানুষের দৈহিক পরিশ্রম (labour)। আদিম সমাজে উৎপাদন চলে সকলের পরিশ্রমে, অর্থাৎ শিশু-রুগ্ন-বৃদ্ধ ভিন্ন সকলেই তখন সাক্ষাৎ-উৎপাদক (direct producer)। এই অবস্থা সম্ভব হয় এইজন্য যে, উৎপাদনের উপাদানগুলি তখনো ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি হইয়া পড়ে নাই। আদিম সমাজ তাই শ্রেণীহীন সাম্যতন্ত্রের সমাজ, যদিও এ-সাম্যতন্ত্র অতি অনুন্নত, দুর্বল ও অভাব-গ্রস্ত। সভ্যতার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে, উৎপাদনের

উপাদানগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া পড়িতেছে, তাহার ফলে সমাজে চোখে পড়ে শ্রেণীবিভাগ, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর (class) অস্তিত্ব। শ্রেণীভেদের মূলে আছে উৎপাদনের সঙ্গে মানুষের নানা ধরনের সম্বন্ধ। সাক্ষাৎ-উৎপাদকের পরিশ্রমেই যাহা উৎপাদন হইতে থাকে, বিনা পরিশ্রমে তাহার অনেকখানি আত্মসাৎ করিয়া তখন মালিক জীবন সম্ভোগ করে। ইহারই আর্থিক নাম হইল শোষণ (exploitation)। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজকে সুশৃঙ্খল রাখিবার জন্য, অন্যদের দাবাইয়া রাখিবার জন্য, মালিকশ্রেণীকে তাই শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া রাজভার হাতে লইতে হয়—রাষ্ট্রকর্তৃত্বের (state) প্রতিষ্ঠা হয় এইরূপে।

ইতিহাসের স্রোত যে-ভাবে বহিতেছে তাহাতে মনে হয় যে, এমন দিন আসিবে যখন উৎপাদনের উপাদান আবার সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে, উৎপাদনের পরিশ্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়া আবার সকলেরই কর্তব্য হইবে। উৎপাদনের উপাদানের মালিক ও পরিশ্রমকারী সাক্ষাৎ-উৎপাদকের মধ্যে তফাত আর তখন থাকিবে না, অর্থাৎ শ্রেণীভেদের অবসান ঘটিবে। এমন সমাজ আসিলে তাহাকে শ্রেণীবর্জিত উন্নত সমাজতন্ত্র বা সাম্যতন্ত্র আখ্যা দেওয়াই উচিত।

ইতিহাসের মূল স্রোত নির্দেশ তাই এইভাবে করা অন্যায় নয়—আদিম প্রাক্-সভ্য সাম্যসমাজ—সভ্য শ্রেণীসমাজ—শ্রেণীবর্জিত সুসভ্য পরিণত সাম্যতন্ত্র। ভবিষ্যতের সাম্য-সমাজকে পরিণত বলার অর্থ এই যে, সভ্য শ্রেণীসমাজের শ্রেষ্ঠ কীর্তি (বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সংগঠন, উন্নত উৎপাদন) এখানে ক্ষুণ্ণ হইবে না। সুখস্বাচ্ছন্দ্য, পরিশ্রমের লাঘব, মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কমিয়া যাওয়ার আশংকা দূরে থাকুক, তাহা হইয়া উঠিবে আরো ব্যাপক, আরো সম্ভব, আরো সহজ।

এক হিসাবে শ্রেণীসমাজ মানুষের ইতিহাসে একটা অন্তর্বর্তী কাল মাত্র, অথচ বেশির ভাগ লোক আজও, সমাজের জ্ঞানী-গুণীরা প্রায় সকলেই ইহাকে সনাতন চিরন্তনী প্রথা বলিয়া মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাস যে অহেতুক অন্ধ বিশ্বাস হইবারই সম্ভাবনা, সে-সম্বন্ধে চিন্তাশীল লোককে সজাগ করিয়া তোলাই তাই এই সামান্য বইখানির মূল লক্ষ্য।

দাসতন্ত্র, সামন্ত-সমাজ ধনতন্ত্র—শ্রেণীসমাজের মৌলিক রূপ যে এই তিনটি, এ কথা যুক্তিসংগত। যে-কোনো সমাজে উৎপাদনের উপাদান আর মানুষের পরিশ্রমের সংযোগের ফল হইল উৎপন্ন জিনিস **(products)**। সকল শ্রেণীসমাজে আবার মালিক ও সাক্ষাৎ-উৎপাদক এই দুই প্রধান ভাগ থাকে—অপর সকল গোষ্ঠী বা শ্রেণীকে ইহার এক বা অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। উৎপাদনের উপাদান এবং পরিশ্রমকারী সাক্ষাৎ-উৎপাদক, উভয়ের উপরই যখন মালিকদের সম্পত্তির অধিকার থাকে তখন প্রতিষ্ঠিত হয় দাস-সমাজ। সমস্ত উৎপন্ন জিনিসও তখন অবশ্য মালিকের সম্পত্তি, আর দাসদের খাওয়া-পরার ভার পড়ে মালিকের উপর। সামন্ত-সমাজে (এশিয়াটিক ও ইওরোপীয় উভয়বিধ) অভিজাত মালিকদের দখলে থাকে উৎপাদনের উপাদানের এবং উৎপন্ন জিনিসের সবটা নয়, প্রধান অংশ। দাস-প্রভুদের মতন সামন্ত শ্রেণীর মালিকেরও সেজন্য কোনো পরিশ্রম করিতে হয় না—সম্পত্তির অধিকার তাহারা ভগবান বা প্রকৃতির বিধান বলিয়া মনে করে। কিন্তু সেইসঙ্গে আশ্রিত ছোটো চাষী ও কারিগরদের রাখিতে দেওয়া হয় উৎপাদনের উপাদানের ও উৎপন্ন জিনিসের খানিকটা অংশ, তাহা হইতেই তাহাদের কায়িক পরিশ্রমে ভরণপোষণ চালাইতে হয়। পূর্ণ ধনতন্ত্রের প্রকৃতি হইল এই যে, এখানে উৎপাদনের উপাদান ও উৎপন্ন জিনিস দাস সমাজের মতন মালিকের সম্পত্তি, কিন্তু সাক্ষাৎ-উৎপাদক আইনত সম্পূর্ণ স্বাধীন। দাস আমলের মতন তাহারা দাস নয়। সাক্ষাৎ-উৎপাদক এখন সামন্ত যুগের মতন ভূমিদাসও নহে, কিন্তু তাহার হাতে উৎপাদনের উপাদান অথবা উৎপন্ন জিনিস কিছু থাকিতে পারে না। উৎপাদনের কোনো উপাদান তাহার অধিকারে না থাকায়, উৎপন্ন জিনিস তাহার নিজস্ব গণ্য না হওয়াতে, সাক্ষাৎ-উৎপাদককে তাই বাঁচিতে হইলে খাটিবার শক্তি (labour power) মালিকের কাছে বেচিতেই হইবে, প্রাপ্ত মজুরির বিনিময়ে খাওয়া-পরা-থাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই তিন মৌলিক ধরন ভিন্ন অন্য শ্রেণীসমাজ কল্পনা করা শক্ত, ইতিহাসেও এইগুলি অথবা ইহাদের মিশ্র রূপ ভিন্ন অন্য কিছুর নিদর্শন পাওয়া যায় না। অবশ্য এই-সব ব্যবস্থার মধ্যে একই সময়ে একাধিকের পাশাপাশি অবস্থান চোখে পড়িতে পারে। তখন সমাজটির প্রকৃতি নির্দেশ করিতে হয় প্রবলতম ব্যবস্থাটার নাম

অনুসারে। মিশ্র রূপকে মৌলিক সমাজের মর্যাদা না দিলেও চলে, ইহা কোনো সামাজিক রূপান্তরের সাময়িক প্রতিফলন মাত্র।

এই প্রসঙ্গের শেষে আর-একটি উল্লেখযোগ্য কথা আছে। বিভিন্ন সমাজ-বর্ণনার অর্থ এই নয় যে, মানুষের প্রত্যেক জাতিকে ঠিক পরপর এই-সকল অবস্থার মধ্য দিয়া সমানভাবে যাইতে হইবে। তাহা হইলে মানুষের ক্রমবিকাশ একেবারে যান্ত্রিক ব্যাপার হইয়া পড়িত। প্রাচ্য দেশগুলিতে দাস-প্রথা ও ইওরোপের সামন্ত-সমাজ ঠিক পূর্ণ প্রকাশ পায় নাই। আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ দিকে এই সেদিন পর্যন্ত দাস-প্রথা ছিল এবং তাহার রূপান্তর হইল ধনতান্ত্রিক সমাজে, সার্ফ-প্রথায় নয়। সোভিয়েট বিপ্লবের পর রুশদেশে কোনো কোনো অনুন্নত জাতি ধনতন্ত্রের আস্বাদ না পাইয়াও সমাজতন্ত্রে পৌঁছিতেছে। এই-সব ব্যাপারে ইতিহাসের অসমান গতির উদাহরণ সুন্দররূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু এই জাতীয় স্থানীয় বিশেষত্ব ইতিহাসের মূল ধারা সম্বন্ধে ধারণা বদলাইবার প্রয়োজন আসে না। ইতিহাসে অগ্রগতির সাধারণ প্রকাশ খুবই সুস্পষ্ট। সব জাতির মধ্যেই প্রথমে আদিম শ্রেণীহীন অসভ্য সমাজের অস্তিত্ব ধরা পড়ে, তাহার পর সবত্রই শ্রেণীভেদ। সেই শ্রেণীভেদ, শোষণ এবং সংঘাতের অবসান একমাত্র ভবিষ্যতের শ্রেণীহীন সভ্য সমাজ গঠনের মধ্যে।

ভবিষ্যতের শ্রেণীবর্জিত সমাজ গড়িয়া উঠিলে সেখানে আর্থিক বিরোধের অবসান হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া মানুষের জীবনে পরিবর্তনের গতি বন্ধ হইয়া যাইবে এবং ইতিহাসে আর-কিছু লক্ষ্য করিবার থাকিবে না, এ কথা ভাবা অন্যায়। সমাজের জীবনযাত্রায় অন্য প্রকারের বা অন্য স্তরের ঘাত-প্রতিঘাত থামিয়া যাইতে পারে না, তাহার মধ্য দিয়া নূতন ধরনের প্রগতির পথে মানুষ তখন চলিতে থাকিবে। শ্রেণীভেদের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক দ্বন্দ্বের শেষ হওয়াই স্বাভাবিক, ইতিহাসে তখন নূতন কোনো পর্যায় শুরু হইবে বলিয়াই মনে হয়। মানুষের আসল উন্নতির হয়তো তখনই হইবে আরম্ভ।

উপরে যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সমাজের উল্লেখ করা হইয়াছে, বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাদের এক-একটি টাইপ (type) বলা চলে। বিজ্ঞান বা অর্থনীতিতে জটিল বাস্তবকে বুঝিবার জন্য প্রাথমিক

রূপনির্দেশের খাতিরে যে model ব্যবহার করা হয়, আমাদের সামাজিক টাইপগুলি আসলে তাহার অনুরূপ। বাস্তব জীবনে কোনো জাতিবিশেষের জীবনযাত্রা উহাদের মধ্যে কোনো-একটির ঠিক যথাযথ ছবি না হইতেও পারে। বিশেষ কোনো দেশে বিশেষ সময়ে উপরে বর্ণিত একাধিক সমাজের লক্ষণ আংশিকভাবে পাশাপাশি থাকিতে পারে। ধনতান্ত্রিক দেশে ধনিক-প্রথার আশেপাশে পূর্বগামী সমাজের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যায়। রুশ-বিপ্লবের আগে সেদেশে অস্ত-গামী ফিউডাল-প্রথার পাশে বর্ধিষ্ণু ধনিকতন্ত্র ছিল। বিপ্লবের পর লেনিন লিখিয়া গিয়াছেন যে, উদীয়মান সোশালিস্ট ব্যবস্থার চারি-পাশে আগেকার আর্থিক ব্যবস্থাও কিছু কিছু চোখে পড়িত। আমাদের দেশে প্রাচীন সামন্ত-সমাজের অস্তিত্ব নূতন ধনিকতন্ত্রের আর্থিক ব্যবস্থার পাশেই টিকিয়া রহিয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, নির্দিষ্ট কোনো সময়ে নানাজাতীয় আর্থিক ব্যবস্থা দেশে থাকিলেও উৎপাদনের ব্যাপারে কর্তৃত্ব থাকে একটি রীতি বা প্রথার হাতে ; সমাজের সাধারণ চেহারা ও নাম নির্ভর করে তাহারই উপর। আমরা যখন বর্তমান জগতের অধিকাংশকে ধনতান্ত্রিক আখ্যা দিয়া থাকি, তখন তাহার এইভাবেই অর্থ করিতে হইবে। বিশ্লেষণের সুবিধার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন আর্থিক বন্দোবস্তের পৃথক আলোচনা করিতে হয়। যুগবিশেষে এক অঞ্চলে একাধিকের অস্তিত্ব চোখে পড়িলেও সাধারণত প্রাধান্য থাকে একটির, তাহাই হইল যুগধর্ম, তাহা হইতেই সেই সমাজের নাম।

আদিম শ্রেণীহীন সমাজ

মার্কসবাদের ভিন্ন ভিন্ন দিক কী কী, ইতিহাস বলিতে আমরা ঠিক কী বুঝি ও তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য কোথায় কোথায়, মানুষ কত রকমের সমাজ গড়িয়াছে—পূর্বের অধ্যায়গুলিতে এই-সব কথার আলোচনা হইয়াছে। এখন আমাদের ইতিহাসের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আর-একটু বিশদ ধারণা সংগ্রহ করিতে হইবে।

খাওয়া-পরার সংস্থান ও প্রয়োজনীয় অন্য সকল জিনিস জোগাড় করার চেষ্টা লইয়া মানুষের আর্থিক জীবন। আদিম যুগ হইতে আজ পর্যন্ত সেই আর্থিক জীবনে বার বার পরিবর্তন আসিয়াছে, আর্থিক ব্যবস্থাকে সময়ের উপযোগী করিয়া বার বার বদলাইতে হইয়াছে। তাহার উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে আলাদা আলাদা সমাজ। সামাজিক জীবনে যখন হইতে শ্রেণীভেদ দেখা দিয়াছে, তখন হইতে আবার এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর ঘাত-প্রতিঘাত হইয়াছে ইতিহাসে সব চাইতে বড়ো কথা। বিরোধের ফলে এক-এক ধরনের সমাজ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তাহার জায়গা লইয়াছে অন্য রকম আর্থিক সম্বন্ধ। ইতিহাসের মধ্যে এই মূল নিয়মগুলির প্রকাশ এইবার আমাদের আরো একটু ভালো করিয়া দেখিতে হইবে।

প্রথমে একেবারে গোড়ার কথা লইয়া আরম্ভ করা যাক। বহুদিন ধরিয়া সকল ধর্ম মানুষকে বুঝাইয়াছিল যে, মানুষ বিধাতার এক বিশেষ সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসাবে ভগবান মানুষ জাতিকে হঠাৎ গড়িয়াছিলেন। বিজ্ঞান এখন বাহির করিয়াছে যে, মানুষের আবির্ভাব কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়, স্বাভাবিক পরিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে মানুষ প্রাণীজগৎ হইতে তফাত হইয়া পড়িয়াছে। একশত বৎসরের কিছু আগে ডারুইন প্রমাণ করিলেন যে, মানুষ ও শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি বানরের আদিপুরুষ ছিল একই জাতীয় জীব। প্রাকৃতিক এভলিউশন বা বিবর্তনের ফলেই মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই বিবর্তনের মূলে আবার রহিয়াছে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য চারি-দিকের অবস্থার সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম।

বানরজাতীয় পূর্বপুরুষদের বংশে মানুষ আসিল বাঁচিবার চেষ্টার

পরিশ্রমের মধ্য দিয়া। বেশি ভালোভাবে জীবনযাত্রা চালাইবার উপায়ের আশ্রয় সন্ধানেই মানুষ প্রথম মানুষ হইয়া ওঠে। বানরদের সঙ্গে মানুষের শারীরিক তফাত এই পরিশ্রমের ফল। সেকালের মানুষ হাতের বেশি ব্যবহার আরম্ভ করে, বানরদের মতন চার হাত-পায়ের সমান ব্যবহার না করিয়া তাহারা দুইটি হাতের সাহায্যে খাদ্য সংগ্রহ করিতে থাকে। এই প্রথম হাতের কাজের ভিতর দিয়া মানুষ খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে শিখিল, বানরের মধ্যে বেশির ভাগ কখনো এই বিদ্যা ভালো করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে নাই। সোজা দাঁড়াইবার চেষ্টার ফলে ক্রমে ক্রমে মানুষের শিরদাঁড়া সোজা হইল, মানবশরীরের গঠনের এই এক বিশেষত্ব। দাঁত দিয়া ফলমূল ছিঁড়িবার অভ্যাসের বদলে মানুষ হাত দিয়া খাবার সংগ্রহ করিত; ক্রমে ক্রমে তাই তাহার চোয়াল আর মুখের নীচের দিকটা ছোটো হইয়া আসে।

হাতের নূতন নূতন কৌশল শিখিবার চেষ্টায় মানুষের বুদ্ধির বিকাশ হইতে লাগিল। বুদ্ধি আসে মস্তিষ্ক হইতে, তাই ক্রমে মানুষের মস্তিষ্কের আধারটাও আকারে বাড়িতে থাকে, তাহার ফলে আবার অন্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের বুদ্ধি অনেক বেশি হইয়া যায়। দৈহিক শক্তি বেশি থাকা সত্ত্বেও সেকালের অনেক প্রাণী লোপ পাইয়াছে, আর বুদ্ধির দৌলতে মানুষ ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। মানুষের ক্রমবিকাশের মূলে রহিয়াছে জীবনধারণের জন্য বেশি পরিশ্রম। প্রথম হইতেই মানুষেরা দল বাঁধিয়া পরস্পরের পরিশ্রমের সহায়তা করে। তাহার ফলে আসিল ভাবিবার শক্তির বিকাশ এবং ভাবের আদানপ্রদান অর্থাৎ ভাষার উৎপত্তি। হাতের কাজ, সোজা হইয়া দাঁড়ানো, মস্তিষ্কের বিস্তর ব্যবহার, কথা বলা প্রভৃতি এক-একটি নূতন ব্যাপার মানুষের আয়ত্তে আসার সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রাণীর তুলনায় মানুষ অনেক বেশি উন্নত হইতে থাকে।

প্রাচীন মানুষের হাড় ও তাহাদের ব্যবহারের নানা জিনিস পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ইওরোপের আদিম মানুষের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধেই খানিকটা ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব। পণ্ডিতেরা বলেন যে, ইওরোপ অঞ্চলে চার বার দীর্ঘদিনস্থায়ী ভীষণ ঠাণ্ডা বরফের যুগ আসে, তাহার মাঝে মাঝে যে-সময় গিয়াছে তখন শীত অনেক কম ছিল। দ্বিতীয়বার বরফের রাজত্ব শেষ হইবার পর যে-যুগ আসে সেই সময়কার মানুষের হাড়

জার্মানির হাইডেল্‌বার্গ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সাম্প্রতিক কিছু কিছু আবিষ্কার বাদ দিলে এখন পর্যন্ত প্রাচীনতম মানুষের চিহ্ন এইখানে।

তখন মানুষের শৈশবকাল, আজ হইতে দুই লক্ষ বৎসরেরও আগেকার কথা। হাইডেল্‌বার্গের মানুষদের হাড়ের সঙ্গে কোনো রকম হাতিয়ার পাওয়া যায় নাই; অনুমান হয় যে, তাহারা গাছের ডাল ভাঙিয়া কিংবা পাথর কুড়াইয়া লইয়া অস্ত্রের কাজ সারিত। অন্য প্রাণী হইতে আত্মরক্ষার জন্য রাত্রে সম্ভবত তাহাদের বানরদের মতো গাছে আশ্রয় লইবার রীতি ছিল। তখন খাদ্য ছিল নিশ্চয় বনজঙ্গলের ফলমূল অথবা ছোটো কোনো জন্তু। মানুষের জীবন তখনো পশুর জীবনযাত্রার অনুরূপ।

বরফের তৃতীয় যুগের সময় মানুষ কোথায় কি ভাবে প্রাণধারণ করিত তাহা অনিশ্চিত। কিন্তু সেইবার বরফ সরিয়া যাইবার পর মনুষ্য জাতি নানাদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তাহার অনেক চিহ্ন এখন পাওয়া গিয়াছে। এই সময় প্রথম মানুষ হাতিয়ার তৈয়ার করিতে শেখে, অন্য প্রাণীদের মধ্যে সে-কৌশল দেখা যায় না। প্রথম হাতিয়ার পাথরে প্রস্তুত হইত; এক-এক টুকরা পাথরকে অন্য পাথর দিয়া ঠুকিয়া হাতিয়ারে পরিণত করা হয়। প্রাচীনতম পাথরের হাতিয়ার-গুলি মোটামুটি তিনকোণা; মোটা দিকটা হাতে ধরিবার জন্য, সরু মুখটা কাজ সারিবার অস্ত্র। এই হাতিয়ারের আঘাতে হরিণ প্রভৃতি জানোয়ারের মাথা ভাঙিয়া ফেলা সম্ভব ছিল। এবার দলবদ্ধ মানুষ শিকারী সম্প্রদায় গড়িতে পারিল, মানুষের সব চাইতে পুরানো সংঘবদ্ধ সমাজ শিকারী দলগুলি। প্রাচীন প্রস্তর-যুগে মানুষের হাড়ের সঙ্গে বড়ো বড়ো জন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, মনে হয় সেকালে পশুদের জলাভূমি কিংবা ফাঁদের মধ্যে বেকায়দায় ফেলিয়া পাথরের হাতিয়ার দিয়া মারিবার প্রথা ছিল। এ কাজ নিশ্চয়ই ছিল পুরুষদের; মেয়েদের কাজ ছিল পাথরের হাতিয়ারের সাহায্যে মাটি খুঁড়িয়া মূল জোগাড় আর গাছ হইতে ফল সংগ্রহ। সমাজে প্রথম শ্রমবিভাগ দেখা দিল ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে। মাংস ও ফলমূল কাঁচাই খাওয়া নিয়ম ছিল। শিকারী সম্প্রদায়ে আহার্য যাহা-কিছু জোগাড় হইত তাহা সকলে মিলিয়া ভোগ করিবার রীতি ছিল, তখনো সমাজে স্তরভেদ দেখা যায় নাই।

একলক্ষ বৎসরেরও আগেকার এই জাতীয় মানুষের হাড় ইত্যাদি ইওরোপে অনেক পাওয়া গিয়াছে। জার্মানির নিয়াণ্ডারথাল উপত্যকা হইতে ইহাদের নাম হইয়াছে নিয়াণ্ডারথাল মানুষ। ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্যে আসিল অনেক উন্নতি। আগেকার হাতিয়ারের বদলে পাথরের ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্র দেখা দিল, পাথর ঘষিয়া মাজিয়া তাহাদের সৃষ্টি। পাথরের ছুরি, বর্শার ফলা, ঠুকিবার জন্য হাতুড়ি ইত্যাদি অস্ত্রের আবিষ্কার হইল ; মানুষ ততদিনে কাঠের তীর-ধনুক ও হাড়ের হাতিয়ার বানাইতে শিখিয়াছে। নিয়াণ্ডারথাল মানুষ আগুনের সন্ধান পাইল সম্ভবত দাবানল হইতে ; কাঠের পর কাঠ জোগাইয়া তাহারা আগুন নিভিতে দিত না। আগুনে পুড়াইয়া মাংস খাইবার রীতিও তখন প্রচলিত হইল। শিকার তখন অনেক সহজ হইয়া আসিয়াছে, দূর হইতে তীর ও বর্শার সাহায্যে মানুষ পশু মারিতে শিখিয়াছে। পাথরের ছুরি দিয়া হরিণ প্রভৃতির ছাল ছাড়ানো ছিল সহজ ; পশুর ছালই মানুষের প্রথম কাপড়। জন্তুদের ছাল গায়ে দিয়া জন্তু সাজিয়া সেকালের মানুষ অন্য পশুদের আরো সহজে মারিতে শিখিল ; অতি পুরাতন গুহার ছবিতে আমরা এই ফন্দির প্রমাণ পাই। তীর দিয়া পাখি ও বর্শা দিয়া মাছ মারা এই সময়কার আর-এক বিদ্যা। ফলমূল ছাড়া মাছ-মাংসও তখন মানুষের নিয়মিত খাদ্য, রাঁধিবার কৌশলেরও সূত্রপাত হইয়াছে. তাই নানারূপ খাবার জিনিস হইতে মানুষের শক্তিও বাড়িতে থাকে। আগুন বাঁচাইয়া রাখার জন্য ডালপালা দিয়া আড়াল করা হইত, ইহাই বোধ হয় মানুষের প্রথম ঘর বাঁধা।

সেকালের মানুষের এই নানা কৃতিত্বে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। শিম্পাঞ্জির তুলনায় নিয়াণ্ডারথালের অধিবাসীদের মস্তিষ্ক অনেকখানি বড়ো দেখা যায়। মানুষের পূর্বপুরুষ একজাতীয় নর-বানরের কিছু কিছু হাড় পাওয়া গিয়াছে. তাহাদের মগজ কিন্তু নিয়াণ্ডারথালীয়দের হইতে ছোটো। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মানুষের মাথার খুলির মধ্যে মগজ ধীরে বাড়িতেছিল। ইহার প্রধান কারণ মাথার ব্যবহার, হাতের কাজের মধ্য দিয়া মানুষের হাত যেমন কৌশলী ও দক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। উন্নতির মূলে তাই দেখি প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহের জন্য দলবদ্ধ পরিশ্রম।

ইওরোপে ক্রমে চতুর্থবার বরফের রাজত্ব আসিল। মধ্য ইওরোপ হইতে তখনই বোধ হয় শীতের তাড়নায় মানুষ দাক্ষিণ ও পূর্বদিকে

ছড়াইয়া পড়ে; পশুর চামড়ার জামা-কাপড়ের প্রচলনও নিশ্চয় তখনকার কথা। দক্ষিণ ইওরোপে ফ্রান্স ও স্পেনে মানুষ হাজার হাজার বৎসর গুহার মধ্যে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেই গুহাবাসীদের জীবনযাত্রার অনেক নিদর্শন এখন পাওয়া গিয়াছে। অনেক গুহায় তখনকার আঁকা ছবি এখনো দেখা যায়—শিকারের চেষ্টাই অবশ্য ছবিগুলির প্রধান বিষয়। কোনো কোনো অঞ্চলে মাটিতে সুড়ঙ্গ কাটিয়া কৃত্রিম গুহা বানানো হইয়াছিল, রুশদেশে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

চতুর্থবার বরফ সরিয়া যাইবার পর ইওরোপে যে-আবহাওয়া আসিল, এখন পর্যন্ত তাহাই সেখানে চলিতেছে বলা যায়। মানুষের জীবনযাত্রায় এবার অনেক পরিবর্তন দেখা গেল। পশুদের মধ্যে অনেকেই শীতের সময় নির্বংশ হইয়া গিয়াছিল, অনেকে আবার দক্ষিণে পালাইয়াছিল, আর ফিরিল না। মানুষের শিকারী জীবন আর ভালো চলিল না, কিন্তু পশু আগের মতন অত প্রচুর না থাকিলেও চারিদিকে বরফগলা জলরাশির মধ্যে মাছ হইল অফুরন্ত। জলের জন্য, মানুষের ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইবার পক্ষেও বাধা ছিল; তাই ইওরোপের অনেক অঞ্চলে এই সময় শিকারী সম্প্রদায়ের বদলে মৎস্যজীবী সমাজের চিহ্ন পাওয়া যায়, জলের ধারে তাহারা ঘর বাঁধিয়া বসিল। এই বাসস্থানগুলির আশেপাশে স্তূপাকার মাছের হাড় ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। অনেক জায়গায় আবার হ্রদের মাঝখানে কাঠ পুঁতিয়া তাহার উপর মানুষে বাড়ি বানাইয়া ছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখা যায়। শিকারী মানুষের স্বভাবই ছিল ঘুরিয়া বেড়ানো, মাছ কিন্তু পাওয়া যায় বিশেষ বিশেষ স্থানে অপর্যাপ্ত ভাবে। মনে হয়, খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থার এই বদলের জন্যই মানুষ স্থির হইয়া বসিয়া লোকালয় গড়িতে শিখিল। এই সময় নূতন হাতিয়ারেরও সৃষ্টি হয়। ঘর বাঁধিবার জন্য দরকার ছিল গাছ কাটিবার; নৌকা বানাইবার জন্য গাছের গুঁড়ি কাটিয়া তক্তা অথবা নৌকার খোল প্রস্তুত করা আবশ্যক হইল। পাথরের কুড়ুল অথবা করাতের সৃষ্টি এইভাবে আসে।

মানুষের এই-সব হাতিয়ার পাথর ঘষিয়া ঘষিয়া তৈয়ার করিতে হইত। প্রাচীন প্রস্তর-যুগের বদলে এখন আসিল পাথর-ঘষা হাতিয়ারের নূতন যুগ। হাতল ঢুকাইবার জন্য কুড়ুলের পাথরে ফুটা

করিবার কৌশল এইসময়কার বিদ্যা। হাতল বাঁধিয়া দেওয়ার চাইতে এই উপায়ই বেশি সুবিধার।

স্থির হইয়া এক জায়গায় বসিবার ফলে মানুষের মনে চাষের ধারণা আসে। বনে বনে ঘুরিয়া ফলমূলের সন্ধান তখন কষ্টসাধ্য। মেয়েরা তাই বাসস্থানের কাছাকাছি মাটি খুঁড়িয়া জংলি মূল সংগ্রহ করিতে করিতে সেই মূল আবার মাটিতে পুঁতিয়া বেশি পরিমাণে খাবার জোগাড় করার কৌশল শিখিল। চাষের সূত্রপাত হয় এই ভাবে। নূতন নূতন তরকারী জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন মানুষ ক্রমে ক্রমে শিখিতে লাগিল। কুড়ুলের মতন আর-একটি হাতিয়ার, কোদালের সৃষ্টি এ কাজে সহায় হয়। ধীরে ধীরে গাছপালা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বাড়িতে থাকে। অনেকদিন পরিশ্রমের ফলে শেষে গম যব ইত্যাদি খাদ্যশস্যের উৎপাদন মানুষের আয়ত্তে আসে। তাহার পর আসল চাষের কাজ আরম্ভ হইল।

শিকারী, মৎস্যজীবী প্রভৃতি আদিযুগের মানবসমাজের ভিতরকার গড়ন সম্বন্ধে সঠিক খবর পাওয়া সম্ভব নয়। তবে তখনকার আর্থিক ব্যবস্থাই ছিল এমন যে, সে-সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব অসম্ভব। মানুষের ইতিহাসে তখন শ্রেণীহীন সমাজের যুগ। সকলে মিলিয়া খাদ্যসংগ্রহ এবং সকলে মিলিয়া ভোগ ছাড়া চলিতে পারিত না—এই অবস্থার নামই আদিম সাম্যতন্ত্র।

সেকালের সামাজিক জীবন ও সম্বন্ধের খানিকটা সন্ধান পাওয়া যায় একালের অসভ্যদের মধ্যে। উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কৃত হইবার পর সেখানে এতকাল পরেও শিকারী সমাজের অস্তিত্ব দেখা গিয়াছিল। এই শ্রেণীহীন অসভ্য সমাজের মধ্যে আমরা মানুষের আদিম সামাজিক জীবনের খানিকটা ছবি পাই।

অসভ্যদের মধ্যে যে-সামাজিক সম্বন্ধের সব চাইতে চল দেখা যায়, পণ্ডিত-মহলে তাহার নাম টোটেমিক। অসভ্য সমাজে এক-একটি ট্রাইব অথবা মূলদলের মধ্যে কয়েকটি করিয়া উপদল অর্থাৎ ক্ল্যান থাকে। উপদলের নামকরণ হয় সাধারণত কোনো বিশেষ প্রাণীর নামে। তাহাকে সংশ্লিষ্ট উপদলটি পরম পবিত্র বলিয়া মনে করে। এমন-কি, নিজেদের সেই প্রাণীর বংশধর বলিয়া কল্পনার প্রচলন হয়। পূজ্য জন্তুগুলিকে টোটেম নাম দেওয়া হইয়াছে। কোনো ক্ল্যান নিজস্ব টোটেমের ক্ষতি করে না, করিলে পাপ; নিষেধসূচক এমন

বিধিবিধানের নাম হইল ট্যাবু। আদিপুরুষ টোটেমের কল্যাণে এক-একটি উপদল এক-একটি বৃহৎ পরিবারের প্রতীক। টোটেমের গোষ্ঠী খানিকটা আমাদের গোত্রের মতন, কারণ উপদলের সকলেই জাতভাই বলিয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ। বড়ো শিকারের সময় ক্ল্যানের লোকেরা কোনো নেতা বাছিয়া লয়; ক্ল্যানের জ্ঞানী বৃদ্ধদের লইয়া দরকারের সময় মন্ত্রণার জন্য বৈঠক বসে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে রাজা বা শাসকশ্রেণী নাই। লোকসংখ্যা যতদিন কম থাকে অন্তত ততদিন উপদলের লোকেরা একসঙ্গেই বসবাস করে—সকলে মিলিয়া খাদ্য সংগ্রহ ও সকলে মিলিয়া ভোগই তাহাদের সাধারণ নিয়ম। বিবাহের নিয়ম বাঁধার উদ্দেশ্য নিশ্চয় ছিল যে, উপদলের লোকেরা ক্ল্যানটিকে যেন এক পরিবার বলিয়া মনে করিতে শেখে। আদিম মানুষের জীবনযাত্রার ধরন পরবর্তী অসভ্য উপদল-গুলির অনুরূপ ছিল মনে করা স্বাভাবিক।

সেকালের ইওরোপে শিকারী সমাজ প্রথমে রূপান্তরিত হয় মাছধরা জেলেদের সমাজে। বহুদিন ধরিয়া এক জায়গায় বসতি করিবার প্রথা তাহারাই আরম্ভ করে। সে-সমাজে আবার পরিবর্তন আসিল চাষবাসের মধ্য দিয়া। খাদ্যশস্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে আর বাঁচিবার জন্য মাছধরা বা শিকারের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইল না। মানুষ পশুপালন করিতে শিখিল; ছাগল, ভেড়া, শূকর প্রভৃতি ছোটো ছোটো জন্তুই প্রথম গৃহপালিত পশু। মাংস ও চামড়ার জন্য তাহাদের আদর ছিল, তবে ভেড়ার লোম গরম কাপড় প্রস্তুত করিবার কাজেও লাগিত। এই সময় মানুষের আর-এক নূতন বিদ্যা দেখা দিল—মাটির হাঁড়ি ও বাসন নির্মাণ। খাবার জিনিস পুঁজি করিয়া রাখিবার জন্য এবং রাঁধিবার কাজে হাঁড়িকুড়ির ব্যবহার আরম্ভ হয়। প্রথম প্রথম হাঁড়ি হাতে তৈয়ার হইত, পরে কুমোরের চাকের আবিষ্কার হয়। মেয়েদের আর-এক নূতন বিদ্যা হইল সূতা কাটা ও কাপড় বোনা। সূতা কাটিবার চরকা আর বুনিবার কাঁটার মতন হাতিয়ার প্রাচীন বসতির ধ্বংসাবশেষে পাওয়া গিয়াছে।

চাষবাস, মাটির হাঁড়ি গড়া, কাপড়বোনা, ছোটো পশুপালন প্রভৃতি কাজে মেয়েদেরই ছিল প্রাধান্য; সমাজেও তাই তখন মেয়েদের কর্তৃত্ব খুব বেশিমাত্রায় থাকা স্বাভাবিক। মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের কাজের মূল্য তখন কম ছিল বলা চলে। পরবর্তী অসভ্য উপদলগুলিও

দেখি প্রায়ই মাতৃপ্রধান, সেখানে মায়ের দিক দিয়া সম্বন্ধ ঠিক হয়। প্রথম যখন ছোটো ছোটো পরিবার দেখা দিতে লাগিল, তখন মেয়েরা ছিল পরিবারের কেন্দ্রে, মায়েরা হইত পরিবারের মাথায় কর্ত্রী, বাপেরা তখন অনেকটা আগন্তুকের মতন। এই প্রথম পরিবারগুলি মাতৃকর্তৃত্বের দৃষ্টান্ত।

কৃষিকার্যের বিস্তারের মধ্য দিয়া ইহার পর আবার পরিবর্তন আসিতে থাকে। কোদালের বদলে লাঙলের ব্যবহার তাহার প্রধান উপায় হইল। কোদাল দিয়া মাটি কোপানো বেশিদূর চলে না, লাঙলের ব্যবহারে তাহার চাইতে অনেক বেশি ফল পাওয়া যায়। প্রথম লাঙলের ফলা পাথরের, হাতল কাঠের; লাঙল কোদালেরই উন্নত রূপান্তর। লাঙলের ব্যবহারে খাইবার জন্য প্রচুর শস্য এবং কাপড় বুনিবার জন্য তুলার চাষ সম্ভব হইল। কিন্তু লাঙল চালাইতে পুরুষের গায়ের জোর দরকার হয়। এই সময় হইতে ছেলেদের কর্তৃত্ব মেয়েদের ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল। কৃষিজীবী পরিবারগুলি ক্রমে ক্রমে পিতৃপ্রধান হইতে থাকে; আর্থিক জীবনে বদলের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা ছেলেদের অধীন হইয়া পড়ে। বহুদিন ধরিয়া কিন্তু নূতন পিতৃপ্রধান পরিবারগুলির আচার-ব্যবহারে সেকালের মাতৃ-কর্তৃত্বের চিহ্ন থাকিয়া যায়। আমেরিকান পণ্ডিত মর্গান দেখাইয়া-ছিলেন যে, গ্রীস ও রোমের পিতৃপ্রধান গোষ্ঠীগুলি আসলে সেকালের মাতৃপ্রধান ক্লানগুলির রূপান্তর। এখানেও রূপান্তরের মূলে আছে আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তন।

কোনো কোনো অঞ্চলে চাষের বিশেষ সুবিধা ছিল না, সেখানে সমাজে রূপান্তর আসে গোরু মহিষ প্রভৃতি বড়ো পশুর প্রতিপালনের ব্যবস্থায়। এইভাবে আর-এক ধরনের সমাজ গড়িয়া ওঠে, আশ্রিত পশুর পাল রাখা তাহার প্রধান কাজ। পশুপালক সমাজ ঠিক এক জায়গায় বেশিদিন থাকিতে পারে না, তাহারা হইল যাযাবর। হাজার হাজার গোরু মহিষ অথবা উট ইত্যাদি লইয়া তাহারা নূতন নূতন গোচারণ মাঠের উদ্দেশ্যে এক অঞ্চল হইতে অন্যদিকে ঘুরিত ফিরিত। তাহারা বাস করিত তাঁবু অথবা খুব সহজে নির্মিত সামান্য কুটিরে। গৃহপালিত পশুর মাংস, দুধ ইত্যাদি ছিল তাহাদের প্রধান খাদ্য। ঘোড়া পোষ মানানো হইল চলিয়া ফিরিবার সুবিধার জন্য। পশুর চামড়া ও লোম হইতে তাহাদের কাপড় জুটিত। পশুপালকেরা

যে-অঞ্চলে কিছুদিন ধরিয়া থাকিত সেখানে সামান্য চাষের কাজও মাঝে মাঝে দেখা যায়। আবার অনেক সময় নিকটবর্তী কোনো চাষী সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাহারা কেনাবেচাও করিতে থাকে। মানুষের মধ্যে জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা এই প্রথম দেখা গেল। পশুপালকের কাজও পুরুষদেরই বেশি উপযোগী। এখানেও তাই পরিবারে বাপের কর্তৃত্ব গড়িয়া ওঠে।

চাষী ও পশুপালক সমাজে ক্রমে ক্রমে দেখি মানুষের আদি-কালের সাম্যের অবস্থা ভাঙিয়া পড়িতেছে, মানুষের মধ্যে ধনী ও নির্ধন পরিবারের পার্থক্য আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। যে-জমিতে চাষ হইতেছে, যে-পশুর পাল জীবিকার প্রধান অবলম্বন, তাহাতে ঠিক ব্যক্তিগত না হউক পারিবারিক সম্পত্তির সূত্রপাত আসিতে থাকে। অসাম্য হইতে শ্রেণীভেদের সূচনা। হাতিয়ারের উন্নতি এই পরি-বর্তনকে আগাইয়া দিতে থাকে। মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখিয়া ধাতু-নির্মিত হাতিয়ার বানাইতে লাগিল—তামা আর তামার সঙ্গে অন্য ধাতু মিশাইয়া ব্রঞ্জ এখন হাতিয়ারের উপাদান হইতে থাকে। সকলের পক্ষে এই-সব উৎকৃষ্ট হাতিয়ার জোগাড় সম্ভব হইত না। আদিম সাম্যতন্ত্রের দিন ফুরাইল। এইবার শ্রেণীসমাজের সূত্রপাত, এইখানে মানুষের আদিম সমাজের শেষ।

আদিম শ্রেণীহীন সমাজের আর্থিক অবস্থার ভিতর হইতে মানুষের প্রথম সংস্কৃতির উদয়। ভাষার প্রচলন, শিল্পকলার উৎপত্তি, ম্যাজিক ও ধর্মের সূচনা, লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার—এইগুলি হইল সে-সংস্কৃতির প্রধান চিহ্ন। ইহার সকলগুলিতেই সেকালের আর্থিক জীবনের স্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। শিকারের সময় হাত-পায়ের সাহায্যে সংকেত, জন্তুদের ভয় দেখানো বা ভুলাইবার জন্য গলার আওয়াজ, হাতিয়ার তৈয়ার করিবার কৌশল পরস্পরকে শিখানো—এই-সব ব্যাপারে ভাষার আরম্ভ হয়। মানুষের বুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও ক্রমশ উন্নতি লাভ করে। হাতিয়ারের সুন্দর গড়নের মধ্যে মনে হয় শিল্পের জন্ম ; গুহাচিত্র আঁকিবার সময় মানুষ শিকারের ধ্যানেই মগ্ন থাকিত ; মাটির হাঁড়িকুঁড়ির মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টির আর-এক দিক দেখিতে পাই। ধর্মের সূচনা ভয়ের ভিতর ; প্রকৃতির শক্তির সামনে অসহায় মানুষ অলৌকিক উপায়ের সাহায্য চায়। শিকারের সুবিধার জন্য, শিকার যাহাতে হাত হইতে না ফসকায় তাই মানুষের মন্ত্রশক্তির

অনুসন্ধান। উপদলগুলির মধ্যে আমরা প্রাণী পূজা দেখিতে পাই। চাষের সুবিধার জন্য রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির আরাধনা আরম্ভ; প্রকৃতিকে মানুষ পুরাপুরি আয়ত্ত করিতে পারে নাই, অথচ তাহার উপর সমস্ত আর্থিক জীবন নির্ভর করাতে প্রকৃতি পূজা আসিয়া পড়ে। অলৌকিক উপায়ে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা হইতে ম্যাজিকের উৎপত্তি, ম্যাজিক অবশ্য প্রাচীন ধর্মেরই প্রধান অঙ্গ। মানুষ ক্রমে আদি পুরুষদের, মৃত কর্তা বা কর্ত্রীদের পূজাও আরম্ভ করিয়া দেয় খানিকটা কৃতজ্ঞতা জানাইতে, খানিকটা ভয়ের জন্য। ভাষার ভাব প্রকাশের সুবিধার খোঁজে, ছবি আঁকিবার পদ্ধতি বদলাইয়া লেখার আরম্ভ হইল। মানুষের সংস্কৃতির মূল যে তাহার আর্থিক জীবন, প্রাচীনতম সমাজের আলোচনায় সে-কথা আমরা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি।

এইখানে মনে রাখা উচিত যে প্রাচীন জগতের কাহিনী এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে অনেকখানি অজ্ঞাত। নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে তাই উপরের রূপরেখাটি বার বার আংশিক পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে। সকল বিজ্ঞান, এমন-কি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। ইহাতে কিন্তু মার্কসবাদের মূল কাঠামোর পরিবর্তন আসে না, তাহার বাস্তব আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গিটুকু থাকে অপরিবর্তিত।

প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্য সমাজ

সেকালের শিকারী ও জেলেদের দলবদ্ধ জীবনযাত্রার আর্থিক গড়নই ছিল এমন যে, তাহার মধ্যে শ্রেণীভেদ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই ; উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ইত্যাদি অঞ্চলে সেদিন পর্যন্ত অসভ্যদের মধ্যে আদিম সাম্যতন্ত্রের ব্যবস্থা ছিল। মানুষ যখন কৃষিপ্রধান ও পশুপালক সমাজের সৃষ্টি করিল, তখন তাহাদের মধ্যে ধীরে ধীরে আসিল সভ্যতা এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের আর্থিক স্তরভেদ। তখনকার দিনের হাতিয়ারের সাহায্যে জমির সাধারণ সম্মিলিত চাষ সম্ভব ছিল না, তাই জমি ভাগের প্রথা আসে ; সেকালের মানুষের বড়ো দল ছোটো-ছোটো পরিবারে ভাগ হইতে আরম্ভ হয়। জমি ভাগ কখনো ঠিক সমান ভাবে হইতে পারে না, জমির মধ্যে ভালো মন্দ থাকে, আর ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের শক্তি ও লোকবল ঠিক সমান হয় না। ধনী ও নির্ধন পরিবারের মধ্যে তফাত ক্রমে বেশি স্পষ্ট হইতে থাকিল।

সেকালের পাথরের হাতিয়ার সকলেই জোগাড় করিতে পারিত, নূতন ধাতুর হাতিয়ার ও অস্ত্র বড়োলোকদের বেশি আয়ত্তে আসিল। বড়োলোকেরা আবার পরাজিত শত্রুদের অনেককে প্রাণে না মারিয়া নিজেদের দাস করিয়া রাখে ; গরিব পরিবারের অনেকেও তাহাদের জমি সমেত ধনীদের কর্তৃত্বের অধীন হইয়া পড়ে। কৃষিপ্রধান গ্রাম ও জনপদের মতন পশুপালক সমাজেও আর্থিক অসাম্য ঢুকিতে লাগিল। সেখানে মূল দলের মধ্যে পরিবারগুলি পৃথক হইতে আরম্ভ করে, তাহাদের আলাদা আলাদা পশুর পাল রাখার রীতি আরম্ভ হয় ; তাহাদের মধ্যে বড়োলোক ও গরিবদের তফাত দেখা যায়।

সমাজে শ্রেণীভেদ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় অসহায় সামান্যবিত্ত বা বিত্তহীন লোকদের উপর সম্পত্তিবানদের অত্যাচার। গরিবদের উপর জুলুম করিয়া তাহাদের পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করা, জোর করিয়া তাহাদের বড়োলোকদের কাজে লাগানো—এই ভাবেই শোষণের ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। সেই হইতে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই শোষণ চলিয়া আসিয়াছে, মাঝে মাঝে হইয়াছে শুধু শোষণের রকমফের। একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত সাম্যতন্ত্রকে জগতে প্রতিষ্ঠিত

করিতে পারিলেই শ্রেণীহীন সমাজ আসিবে এবং শোষণের শেষ হইবে। সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য তাহাই। তবে আদিম সাম্যতন্ত্র ছিল আর্থিক দুরবস্থা ও দারিদ্র্যের যুগ। বৈজ্ঞানিক সাম্যতন্ত্রের উপর গড়িয়া উঠিবে আর্থিক সচ্ছলতা ও নূতন সভ্যতা। তাহার পর সম্ভব হইবে মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সকল শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ।

কৃষিপ্রধান গ্রাম ও জনপদগুলিতে প্রথম সভ্য শ্রেণীসমাজ গড়িয়া ওঠে, শোষণ রীতির আবির্ভাব হয় এবং ধনীদের কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য তাহাদের শাসিত রাষ্ট্রের আরম্ভ দেখা যায়। মানুষের ইতিহাসে এই পরিবর্তন প্রথম দেখা গেল উত্তর আফ্রিকা ও এশিয়ার বিশাল নদীগুলির ধারে ধারে। মার্কস ১৮৫৯ সালে তাঁহার এক সুবিখ্যাত 'ভূমিকা'য় ইহাকে এশিয়াটিক সমাজ নাম দিয়াছিলেন। মানুষের ইতিহাসে এই আদি সভ্যতাগুলিকে সামাজিক বিশ্লেষণের দিক দিয়া মাঝে মাঝে প্রাচীন সামন্তসমাজ, কিম্বা এশিয়াটিক সামন্ততন্ত্র আখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। এখানে প্রাচীন কিম্বা 'এশিয়াটিক' বিশেষণ দুইটি ব্যবহারের উদ্দেশ্য হইল প্রাচ্যের এই সমাজব্যবস্থাকে ইওরোপের প্রসিদ্ধ মধ্যযুগীয় ফিউডাল সামন্ততন্ত্র হইতে পৃথক করিয়া দেখা। এই দুইয়ের মধ্যে তফাত নিতান্ত কম নয়, যদিও মূল প্রকৃতি উভয়-ক্ষেত্রেই কিছুটা সামন্ততান্ত্রিক।

এশিয়াটিক সমাজ বরাবরই সামন্ততান্ত্রিক অর্থাৎ ফিউডাল ছিল কিনা, কিম্বা কতটা ছিল, ইহাতে কিন্তু অনেকের গভীর সন্দেহ আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, প্রাচ্যদেশেও পরবর্তী ইওরোপের মতন অসভ্য সমাজ রূপান্তরিত হয় প্রথমে দাসতন্ত্রে, পরে সামন্ত সমাজে। অন্য মত অনুসারে, দাসতন্ত্র ও সামন্ত সমাজ, পর পর এই দুই পর্যায়ের স্বতন্ত্র ব্যাপক অস্তিত্ব প্রাচ্যের ইতিহাসে সঠিক ধরা পড়ে না, যেমন পড়ে ইওরোপের ক্রমবিকাশে। এই মতানুসারে এশিয়ার প্রাচীন সমাজ দাসতন্ত্রও নয়, সামন্ততন্ত্রও নয়, আসলে অন্য কিছু। আধুনিক গবেষণায় পণ্ডিতেরা আবার এই এশিয়াটিক সমাজের মধ্যে বেশ কিছুদিন পর সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব দেখিতে পাইয়াছেন।

আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, মার্কসবাদী ইতিহাস অচল অনড় পদার্থ নয়। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার কিছুটা পরিবর্তন স্বাভাবিক যদিও দৃষ্টিভঙ্গি একই থাকিয়া যায়। সকল বিজ্ঞানেরই ধরন হইল এই।

কূট তর্কের মধ্যে না গিয়া আমরা এখানে এইটুকুই ধরিয়া লইব যে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম শ্রেণী-বিভক্ত সভ্য রাষ্ট্র-শাসিত সমাজের পরিচয় পাওয়া গেল মার্কস-কথিত এশিয়াটিক সমাজে। এই সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র মিশরের নীল নদ, ইরাকের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস, চীন দেশে হোয়াংহো ও ইয়াং সিকিয়াং, এবং ভারতের সিন্ধু ও গঙ্গা নদীর উর্বর উপকূলে। এই-সব অঞ্চলে প্রতি বৎসর নদী কূল ছাপাইয়া চারিদিক প্লাবিত করিত ; বন্যার জল সরিয়া গেলে সেই পলিমাটিতে চাষ করাও সহজ ছিল। এই-সব দেশের আবহাওয়াও বেশি ঠাণ্ডা নয়। নদীর ধারে ধারে লাঙলের ব্যবহার প্রথম বিস্তৃতভাবে আরম্ভ হয়। প্রচুর শস্যোৎপাদন সম্ভব হইল, সমাজের মধ্যে সম্পত্তিবান ও দরিদ্রের তফাতও দ্রুতবেগে ছড়াইয়া পড়ে। প্রথম সংগঠিত সভ্যসমাজ, শাসকশ্রেণী ও রাষ্ট্রের এইখানে আরম্ভ হইল।

ইহার মধ্যে প্রাচীনতম জনপদগুলি গড়িয়া ওঠে বর্তমান ইরাক দেশের দুই নদীর ধারে, সেকালে এদেশের নাম ছিল সেনার। প্রায় সাত হাজার বৎসর আগে এই অঞ্চলের দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের কাছা-কাছি সুমের জাতির বসতি দেখা যায় ; উত্তর দিকটায় আরবদেশ হইতে আগত আক্কাদ জাতির আবাস ছিল, তাহারা এককালে যাযাবর পশুপালক ছিল। সুমের ও আক্কাদ জনপদগুলিকে আমরা প্রথম সভ্য শ্রেণীসমাজ বলিয়া ধরিতে পারি।

সেদেশে তখন চারিদিকে অতিরিক্ত জল, নদীর প্লাবন ও বৃষ্টির জলে দেশ জলাভূমিতে পরিণত হইবার আশঙ্কা ছিল ; জল সরিয়া গেলে আবার বৎসরের খানিকটা সময় জলের টানাটানিও পড়িত। এখানে মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিয়া সমাজ গড়িতে হইল। অসংখ্য বাঁধের সাহায্যে বন্যার জল আটকাইবার ব্যবস্থা হয় ; অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় গ্রাম, বাড়িঘর, মন্দির, প্রাসাদ ইত্যাদি নির্মিত হইল, বাঁধ দিয়া জল ধরিয়া রাখা হইত, ছোটো ছোটো খালের ভিতর দিয়া আবার সেই জল দরকারমতো চাষের জমিতে আনার আয়োজনও হইয়াছিল। এই-সব ব্যবস্থার ফলে সুমের আক্কাদে কৃষিকাজ ছড়াইয়া পড়ে আর প্রচুর শস্য উৎপাদন ও ধনসঞ্চয় সম্ভব হয়। সেইসঙ্গে প্রথম হইতে লাভের অধিকাংশ সম্পত্তিবানদের ভোগে আসিতে লাগিল, আর বাঁধ নির্মাণ ও চাষে পরিশ্রমের বেশির ভাগটা সাধারণ লোকের ঘাড়ে পড়ে। প্রথমে গ্রামগুলির জীবনযাত্রা নিশ্চয়

সম্মিলিত ভাবে চলিত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভালো জমি ধনীদের ভোগে আসে আর অন্যদের উপর তাহাদের কর্তৃত্বও বিস্তৃত হয়। সাধারণ চাষীদের শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষার উপযুক্ত অস্ত্রও ছিল না। শত্রু আটকাইবার ভারটা ধনীরাই নিজেদের হাতে রাখে, ব্রঞ্জের নূতন অস্ত্রশস্ত্র হয় তাহাদেরই সম্পত্তি। তাহারা তাই সহজেই সাধারণ লোকের পরিশ্রমের ফলে ভাগ বসাইতে লাগিল। সমাজের মাথায় শাসক ও শোষক শ্রেণী আসিয়া দাঁড়াইল।

সুমের ও আক্কাদে এইভাবে ছোটো ছোটো খণ্ড রাজ্য দেখা দেয়। প্রত্যেক খণ্ডরাজ্যে এক-একজন ছোটোখাটো প্রধান বা স্থানীয় রাজা ছিল, তাহাদের ইসাক বলা হইত; আসলে তাহারা ছিল সেই এলাকার জমিদার ও পুরোহিত প্রভৃতির নেতা। ইহারা সকলেই অনেকখানি জমি দখল করিয়া বসে। সাধারণ চাষীদের কাছ হইতে প্রভুশ্রেণী এখন রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করে, তাহাদের নিজ নিজ উৎপন্ন শস্যের অনেকখানি করিয়া প্রভুদের হাতে তুলিয়া দিতে হইত। প্রভুরা এখন কর্মচারী নিয়োগ করিতে থাকে, ইহাদের কাজ হইল চাষীদের কাছ হইতে দেয় ট্যাক্স সংগ্রহ। সাধারণ লোকের উপর প্রভুদের দ্বিতীয় দাবি ছিল বেগার খাটা। বাঁধ ও খালগুলির সংস্কার, মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে সাধারণ লোককেই খাটানো হইত। প্রভুদের নিজেদের জমি চাষ করিবার কাজে যাহাদের লাগানো হইত, তাহারা আসলে ছিল প্রায় দাসদের শামিল। বেগার খাটানোর সময় লোকদের চালাইবার ও দরকার মতন শাস্তি দিবার জন্য কর্মচারী থাকিত। মন্দির ও প্রাসাদের সঙ্গে কিছু কিছু কারিগর রাখা হইত, প্রভুদের ভোগের জন্য নানারকম জিনিস প্রস্তুত করা ছিল তাহাদের কাজ। বড়োলোকদের হিসাব রাখিবার জন্য কেরানির আবির্ভাব হইল, সুমের দেশে টুকরা টুকরা শক্ত পোড়ামাটির পাতের উপর খোদা অসংখ্য হিসাবপত্র পাওয়া গিয়াছে।

ইসাকদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো মন্দিরের পুরোহিত ছিল—সুমের দেশে এনলিল ও আক্কাদদের শামাস দেবতার পূজারী দুইজনের উল্লেখ করা যায়। ক্রমে প্রধানদের মধ্যে কেহ কেহ অন্যদের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিয়া সারা দেশের মহারাজা হইয়া বসে। রাজাদের মধ্যে উত্থান-পতন যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়া আসিত; সেই লড়াইয়ের খারাপ ফল ভোগ করিতে হইত সাধারণ প্রজাদের।

পুরোহিতদের প্রধান কাজ হইল জনসাধারণকে ভুলাইয়া রাখা। তাহাদের ধর্ম লোককে শিখাইল যে, রাজা ও প্রধানেরা দেবতার বংশধর, তাহাদের অমান্য করা পাপ, যে-পাপের শাস্তি ইহকাল ও পরকালে ভোগ করিতে হয়। ধর্ম প্রচার ছাড়াও লোকদের চাপিয়া রাখিবার জন্য প্রভুরা অস্ত্রসঞ্চয় করিয়া রাখিল—নিজেদের বাসস্থানের চারিদিকে পোড়া ইটের শক্ত দেওয়াল গাঁথিয়া দুর্গ প্রস্তুত করিল। ধর্ম ও অস্ত্রবলের জোরে শোষণের ব্যবস্থা পাকা হয়। প্রভুদের ধনলাভের জন্যই আবার সুমের ও আক্কাদে বাণিজ্যের সূত্রপাত হইল। এই বণিকেরা আসলে প্রভুদেরই আশ্রিত ভৃত্য; এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের আদানপ্রদান এ-সময় যতটুকু দেখা যায়, তাহার লাভের প্রধান অংশটুকু তাই প্রভুদেরই পুঁজি বাড়াইবার উপায় ছিল।

সুমের ও আক্কাদে শ্রেণী-বিরোধ মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে সারা দেশ আলোড়িত করিয়া ফেলে। সাড়ে চার হাজার বৎসরেরও আগে এক প্রজাবিদ্রোহের কথা আমরা জানি, প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া দেশে তখন অরাজকতা চলে। পুরাতন রাজা ও প্রধানদের জায়গায় নূতন অনেকের হাতে এই সময় ক্ষমতা আসে, কিন্তু শোষণের শেষ হয় নাই। ক্রমে শারু-কিন নামে একজন নেতা সমস্ত সুমের ও আক্কাদ জয় করিয়া প্রথম সম্রাট হইয়া বসেন। সুমের ও আক্কাদে এবার সাম্রাজ্য দেখা দেয়; সেই সম্রাটদের কীর্তিকলাপ, যুদ্ধবিগ্রহ, জীবন-কাহিনী লইয়া ইতিহাস-লেখকেরা সাধারণত ব্যস্ত থাকেন। সাম্রাজ্যের গৌরবের আড়ালে দেখি যে, প্রজাসাধারণের উপর আগেকার মতন শোষণের ব্যবস্থা চলিতেছে, তফাতের মধ্যে এখন খণ্ড খণ্ড রাজ্যের ভিতর স্থানীয় লড়াইয়ের অবসান হইয়াছে। সম্রাটের শক্তি আরো প্রবল, আরো অবাধে প্রজাদের লুণ্ঠন চলিতে পারে; পুরোহিতেরা তাই সাম্রাজ্যের সহায়ক ছিল। তবে সামন্ত প্রথায় যেমন হইয়া থাকে, নিজের স্বার্থ লইয়া ছোটো ছোটো রাজারা সুবিধা পাইলেই সম্রাটকে বিব্রত করিতে ছাড়িত না। অন্তহীন কাড়াকাড়ির ফলে হয়তো এক সম্রাটের পতন ও আর-একজনের উদয়, এক বংশের জায়গায় নূতন বংশের আবির্ভাব হইত।

রাজাদের মধ্যে এই অদল-বদল আসলে ইতিহাসে অত্যন্ত ছোটো কথা, তাহার মধ্যে সামাজিক প্রগতি প্রায় কিছুই দেখা যায় না।

জনপদের সাধারণ লোকদের জীবনযাত্রা আগের মতনই চলিতে থাকে, এক রাজার বদলে অন্য রাজা আসাতে মূল শোষণ-প্রথার কিছু ইতরবিশেষ হয় না। সাধারণ লোকের পরিশ্রমের ফলে ভাগ বসাইয়া উপরের শ্রেণীগুলি যে-ধন আত্মসাৎ করে, তাহারই ভাগবাঁটোয়ারা লইয়া ঝগড়ার কথাকে প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া ভুল করা উচিত নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রাচ্যদেশগুলিতে পরিবর্তন আসিতে থাকে শুধু রাজা ও রাজবংশগুলির উত্থান-পতনে। তাহার মাঝে মাঝে শুধু দেখি নিষ্ফল প্রজাবিদ্রোহ, নিষ্পেষিত সাধারণ লোকের মুক্তি পাইবার ব্যর্থ চেষ্টা ও তাহাদের দমন। এক এক সাম্রাজ্য যেই গড়িয়া ওঠে তখন শোষণ হয় কেন্দ্রীভূত, আবার সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িলে স্থানীয় প্রধানেরা সর্বেসর্বা হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে প্রজা-সাধারণের অবস্থার বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না।

যিশুখৃস্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর আগে সুমের ও আক্কাদের সাম্রাজ্যভার আসিয়া পড়ে বাবিলন নগরীর প্রধানদের হাতে। ইহার পর হইতে সমস্ত অঞ্চলটি বাবিলনিয়া নামেই প্রসিদ্ধ হয়। সম্রাট হাম্বুরাবির আইনকানুন এই সময় প্রচারিত হইয়াছিল, ঐতিহাসিক মহলে তাহার খুব খ্যাতি আছে। হাম্বুরাবি সম্পত্তিবান-দের স্বার্থ সুরক্ষিত করিয়াছিলেন, সাধারণ লোকদের শৃঙ্খল হইয়াছিল দৃঢ়তর। জমিদার, পুরোহিত ও বণিকদের স্বার্থরক্ষায় তাঁহার কোনো অবহেলা ছিল না, তাঁহার আইনের ছত্রে ছত্রে তাহার প্রমাণ আছে। বেগার খাটানোর সুব্যবস্থাও তাঁহার বিধানের মধ্যে দেখিতে পাই।

ইহার প্রায় হাজার বৎসর পরে উত্তরের পাহাড়ে অঞ্চল হইতে আসেরীয় রাজারা প্রভাব বিস্তার করে, বাবিলনিয়া ও আশেপাশের সকল দেশই তাহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়ে। আসেরীয়দের অস্ত্রবল ছিল অসাধারণ; লোহার অস্ত্র ব্যবহার ও বিশাল সৈন্যদল গঠন তাহাদের দুই শতাব্দী অজেয় করিয়া রাখিয়াছিল। আসেরীয় সাম্রাজ্য পারস্য হইতে মিশর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে, শাসকেরা স্বেচ্ছাচারী সম্রাটরূপে নানা জাতিকে লুণ্ঠন করিয়া প্রবল প্রতাপে কর্তৃত্ব করিত। কিন্তু সেই প্রতাপের আড়ালেও দেখি পুরোহিত ও স্থানীয় প্রধানদেরই জনসাধারণের উপর আধিপত্য। সম্রাটের অবাধ ক্ষমতা প্রধানদেরই স্বার্থরক্ষা করিয়া চলিত। আসেরীয়দের অত্যা-

চারের বিরুদ্ধে দুর্বল জাতিরা বারবার বিদ্রোহের চেষ্টা করে ; চাষী ও দাসেরা সেই বিদ্রোহে যোগ দেয়। অন্তর্বিরোধে আসেরীয় সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া ভাঙিয়া পড়িল।

তাহার পর আবার এক শতাব্দীকাল স্বাধীন বাবিলনিয়ার নূতন সাম্রাজ্য মাথা তোলে—ইতিহাসে ইহার নাম কালডিয়া সাম্রাজ্য। কালডিয়ার পর পারস্য সাম্রাজ্য সম্রাট কাইরাসের সৃষ্টি। খৃস্টের জন্মের ৩৩০ বৎসর আগে পারস্য সাম্রাজ্য গ্রীক আলেক্জাণ্ডারের পদানত হয়। এইখানে পশ্চিম এশিয়ায় প্রাচীন যুগ শেষ হইল।

বাবিলনিয়া ও কালডিয়ার প্রাচীন সংস্কৃতির ইতিহাসে খুব নাম আছে। ধনী পুরোহিত ও প্রধানদের আর্থিক স্বার্থ হইতে তাহার জন্ম ; পরবর্তী ইওরোপে তাহার প্রভাব সামান্য নয়। সুমেরীয়গণ হিসাব রাখিবার জন্য লিখিবার পদ্ধতি ও নানাপ্রকার ওজনের পরিমাণ উদ্ভাবন করিয়াছিল। সময়ের হিসাব রাখাও তাহাদের কীর্তি। বৎসরকে বারো মাসে ভাগ করা, সপ্তাহের সাত দিনের বিশেষ নাম-গুলি, প্রতিদিবসের মধ্যে দিনের আলোর বারো ঘণ্টা ও রাত্রির বারো ঘণ্টা নির্দেশ—এই-সব বাবিলনের সৃষ্টি। নক্ষত্র ও গ্রহদের মধ্যে পার্থক্য, তাহাদের নামকরণ ও গতি নির্দেশ ইত্যাদি অবলম্বনে জ্যোতির্বিদ্যার আরম্ভ এইখানে। বাবিলনীয় পুরোহিতদের এই-সব বিদ্যা পরে গ্রীকরা গ্রহণ করে।

প্রাচীন মিশরের সভ্যতা সুমেরীয়দেরই সমসাময়িক—উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও অনেক। পুরাতন এশিয়াটিক সমাজের বিকাশ এই অঞ্চলেও আমরা দেখিতে পাই। মিশরে বৃষ্টি নাই, কিন্তু নীলনদের বার্ষিক বরফগলা প্লাবন সমস্ত দেশটিকে উর্বর করিয়া রাখিয়াছে; নদীর জলরাশিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টায় এখানকার ইতিহাসেরও সূত্রপাত হয়। উঁচু জমিতে গৃহ, মন্দির ইত্যাদি নির্মিত হইল ; বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা হয় ; নীচু জমিতে বন্যার জল ধরিয়া রাখিয়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা হইত ; সেই জল ছোটো ছোটো খালের ভিতর দিয়া ক্ষেতে ও বাগানে আনিবার বন্দোবস্ত করা হইল। এই-সব আর্থিক আয়োজনের মধ্যে মিশরের সভ্যসমাজ গড়িয়া ওঠে প্রায় ছয়-সাত হাজার বৎসর আগে। বলা বাহুল্য, এখানেও সমাজ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ হইয়া যায়—আর্থিক বদলের পর সেকালের সাম্যতন্ত্র আর টিকিল না। সুমের ও আক্কাদের মতন

মিশরেও খণ্ড খণ্ড ছোটো রাজ্য দেখা দিল—প্রত্যেকটির মধ্যে সম্পত্তিবান শাসকশ্রেণী ও সাধারণ প্রজার তফাত স্পষ্ট হইল। মিশরে প্রায় চল্লিশটি টুকরা টুকরা রাজ্য হইল—তাহাদের নাম নানাপ্রকার জন্তুর নামে। অনুমান হয় যে, আগে এই প্রদেশগুলি বিভিন্ন টোটেমিক দলের বাসস্থান ছিল, সেই টোটেম হইতেই নামগুলি আসিয়াছে। ক্রমে উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি বড়ো মিলিত রাজ্য গড়িয়া ওঠে। এখন হইতে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর আগে সেই দুইটি রাজ্য যুক্ত হইয়া সমস্ত দেশ এক-রাজ্যে পরিণত হইল। দেশের রাজার উপাধি হইল ফেয়ারো।

মিশরের রাজাকে দেবতার পুত্র ও দেশের সর্বেসর্বা মালিক বলিয়া ঘোষণা করা হইলেও স্পষ্টই বোঝা যায় যে, রাজা ছিল শাসকশ্রেণীর মুখপাত্র—সেই শ্রেণী স্থানীয় সম্পত্তিবান প্রধান ও পুরোহিতদের লইয়া গঠিত। তাহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি ছিল, সাধারণ প্রজার পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করিয়া বৎসরের পর বৎসর তাহাদের ধন-বৃদ্ধি হইত। রা প্রভৃতি দেবতার পূজারীদের আর কোনো কোনো সামন্তের ধনসম্পদ ফেয়ারো অপেক্ষা কম ছিল না। পুরোহিত ও প্রধানদের মধ্যে নিবিড় যোগ দেখা যায়। রাজাকে সম্পত্তিবান শ্রেণীর মুখ চাহিয়া তাহাদের স্বার্থ মানিয়া চলিতে হইত। এশিয়াটিক সমাজে পুরাকালেই আমরা দেখিতে পাই যে, রাষ্ট্রশক্তি সমস্ত লোকের উপরে স্থিত নিরপেক্ষ ন্যায়ধর্মের প্রতীক নয়—সমাজে বিত্তবান শাসক শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধি ও কার্যোদ্ধারের উপায় হিসাবে রাষ্ট্রের জন্ম; বঞ্চিত শ্রেণীকে দাবাইয়া রাখাই তাহার ধর্ম, অস্ত্রশক্তির প্রাধান্যই তাহার নির্ভর। মিশরে তাই দেখি সাধারণ লোকের উপর অবাধে শোষণ চলিয়াছে শুধু রাজাদের নয়, সমস্ত সম্পত্তিবান শ্রেণীর।

এখানেও প্রজার কাছ হইতে আদায় হইতেছে উৎপন্ন শস্যের অনেকখানি অংশ এবং প্রয়োজন হইলেই বেগার পরিশ্রম। রাজার মতন মন্দিরের পূজারী ও জমিদারেরাও প্রজাদের লুণ্ঠনে ভাগ বসাইতেছে। এখানে প্রাচীন ছবিতেও দেখি, চাষীরা শস্য আনিয়া ধনীর ভাণ্ডারে ঢালিয়া দিতেছে, টুকরি বোঝাই করিয়া প্রভুর কাছে ভেট দিতে চলিয়াছে, চাবুকের তাড়নায় নৌকা প্রস্তুত করিতেছে, খাজনা না দেওয়ার অপরাধে কর্মচারীর হাতে লাঞ্ছিত হইতেছে। শস্যের অভাবে চাষীরা জলাজমির আগাছা হইতে খাদ্যসংগ্রহ করিয়া বাঁচিয়া

থাকিত, ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহার উপরে ছিল শক্তিশালী রাজাদের অত্যাচার—সাধারণ শোষণের উপর আবার রাজার মহিমা বাড়ানোর জন্য বেগার খাটা। প্রাচীন মিশরের জগদ্‌বিখ্যাত কীর্তি, বিশাল পিরামিডগুলি এই বেগার পরিশ্রমের নিদর্শন। সম্রাট হুফু ত্রিশ বৎসর হাজার হাজার লোক খাটাইয়া সবচাইতে বড়ো পিরামিডটি নির্মাণ করিয়াছিলেন নিজের উপযুক্ত সমাধি-মন্দির গড়িবার জন্য। পাথরগুলি লোকদের ঘাড়ে করিয়া কিংবা টানিয়া আনিতে হইয়াছিল, কাজে অবহেলা হইলে শাস্তি ছিল চাবুক। এই হুফুকে আবার পুরোহিতরা মৃত্যুর পর দেবতার মর্যাদা দিয়াছিল। সাধারণ লোককে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য মিশরে ধর্মের বহুল প্রচলন হয়; শাসকেরা দেবতার মতন, তাহাদের অমান্য করা পরম পাপ, পরলোকে শান্তির জন্য এ-জীবনের দুঃখকষ্ট মানিয়া লওয়া উচিত—ধর্মের প্রধান কথাই ছিল এই।

যিশুর জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগে মিশরে ভীষণ প্রজাবিদ্রোহ হয়। পুরোহিতদের সাহায্যে অরাজকতা দমন করিয়া দক্ষিণের থীব্‌স্‌-এর সামন্তেরা এইবার ফেয়ারো হইয়া বসিল। সাত শত বৎসর পরে আবার প্রজাবিদ্রোহ সমস্ত দেশ আলোড়িত করে। এবার বিদেশ হইতে হিক্‌সস জাতি আসিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিল। দেড়শত বৎসর পরে থীব্‌সের অধিপতিরা বিদেশীদের তাড়াইয়া এক প্রবল সাম্রাজ্য গড়িল। বিশাল সৈন্যবাহিনী এই ফেয়ারোদের প্রধান অবলম্বন ছিল; তাহারা অন্য দেশেও সাম্রাজ্য বিস্তার করিল। পরবর্তী আসেরীয় সাম্রাজ্যের মতন মিশর এই সময়ে সামরিক শক্তিসম্পন্ন কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যের আকার লইল। তৃতীয় থুটমসিস এই সম্রাটদের মধ্যে দিগ্‌বিজয়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তনে দেশে শোষণের বিশেষ বদল দেখা যায় না। প্রজাদের কাছে সম্রাটেরা ছিল ঈশ্বরের অবতার, অসীম শক্তিশালী; সম্পত্তিবানদের কাছে সম্রাট রক্ষক ও স্বার্থসিদ্ধির উপায় মাত্র। শোষিত শ্রেণীর অসন্তোষ দমনের জন্য বিদেশ হইতে ভাড়াটে সৈন্য রাখিয়া শান্তি রক্ষা করা হইত। অন্য দেশ লুণ্ঠন করিয়া সম্রাট ও তাহার অনুচরদের ধনবৃদ্ধির ব্যবস্থাও দেখা যায়।

ইহার পর মিশরের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা রাজার সঙ্গে পুরোহিতদের কিছুদিন ব্যাপী দ্বন্দ্ব। সম্রাট ইখ্‌নাটন এক নূতন

ধর্মের সৃষ্টি করিয়া পুরাতন পুরোহিতদের ক্ষমতা নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরোহিতদেরই জয় হয়। পূজারীরা প্রজাদের অসন্তোষকে কাজে লাগাইয়া বিদ্রোহের ভিতর দিয়া রাজার চেষ্টা ব্যর্থ করে। মিশরের শেষ ফেয়ারোগণ পুরোহিতদের আজ্ঞাবহ ছিল। পুরোহিত ও সেকালের সামন্ত শ্রেণী প্রায় অভিন্ন। সম্রাট-দের অসীম ক্ষমতার মুখোস এইভাবে খুলিয়া গেল। রাষ্ট্র যে চলে শাসকশ্রেণীর স্বার্থে, রাজার খেয়ালে নয়, এখানে তাহার প্রমাণ পাই।

ইহার কিছুদিন পরে মিশর প্রথমে আসেরীয়, পরে পারস্য সাম্রাজ্যের প্রদেশ হইয়া পড়ে। তাহার পর আসে আলেক্‌জাণ্ডারের দিগ্‌বিজয়।

প্রাচীন মিশরে সভ্য সমাজের প্রথম সংস্কৃতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে সাহিত্য ও শিল্পকলার জন্ম উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যে কবিতা ও গল্পের প্রচলন হয়, অনেক গল্প বিদেশেও ছড়াইয়া পড়ে। সমাধি-মন্দির সাজাইবার জন্য ছবি আঁকা আরম্ভ হয়, প্রভু-শ্রেণীর মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে মূর্তি গড়া হইতে থাকে। প্রাসাদ মন্দির গঠনে নানা কৌশলেরও আরম্ভ দেখি। মিশরে লিখিবার পদ্ধতির অনেক উন্নতি হয়—এই লেখার কতকগুলি সংকেতচিহ্ন পরে ফিনিসীয় বণিকেরা অক্ষরে পরিবর্তিত করিয়া গ্রীকদের মধ্যে চালায়। জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি প্রভৃতির আলোচনাও মিশরে হইত বলিয়া মনে হয়। সুমের ও মিশর দেশকে সভ্যতার জন্মভূমি গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সে সভ্যতার মাঝে যে-সমাজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহার আর্থিক বনিয়াদ ছিল শ্রেণীভেদের আবির্ভাব এবং সাধারণ লোককে শোষণ করিবার পাকা বন্দোবস্ত।

চীন ও ভারতবর্ষেও অতি প্রাচীন কালে সভ্যতার উদয় হয়, তাহার কীর্তিও বড়ো কম নয়। কিন্তু এই অঞ্চলের সভ্যতার সঙ্গে বাহিরের জগতের যোগাযোগ বেশি ছিল না : ইহাদের প্রভাব চারিদিকে, বিশেষ করিয়া ইওরোপের দিকে ছড়াইয়া পড়ে নাই। ভৌগোলিক বাধা তাহার প্রধান কারণ, মরুভূমি ও পাহাড় মিলিয়া দেশ দুইটিকে আগেকার দিনে স্বতন্ত্র রাখিয়াছিল। কিন্তু এদিককার সমাজও কিছু সৃষ্টিছাড়া ছিল না, এখানেও শ্রেণীভেদ ও শোষণের ব্যবস্থার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

চীনে কৃষিপ্রধান সভ্যসমাজ প্রথম গড়িয়া ওঠে হোয়াংহো নদের উর্বর অঞ্চলে—পরে ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপকূলে তাহার বিস্তৃতি হয়। এখানেও মানুষকে চেষ্টা করিতে হয় জলপ্রবাহকে স্ববশে আনিবার জন্য। তাই নদীর জলকে বাঁধ দিয়া লোকালয় হইতে দূরে রাখিতে হয়, আবার খাল কাটিয়া ক্ষেতে জলসেচনের বন্দোবস্তও দরকার হইয়া পড়ে। এই-সব ব্যবস্থা করিতে জনসাধারণের অক্লান্ত পরিশ্রম লাগে, তাহার ফলভোগ করে প্রধানত সম্পত্তিবান লোকেরা। চীনেও তাই শ্রেণীভেদ ও বড়োলোকদের কর্তৃত্ব প্রবল হইয়া ওঠে। এখানেও প্রথম অসংখ্য খণ্ডরাজ্য দেখা দিল, স্থানীয় প্রধানেরা ছিল ইহাদের মাথায়; তাহারা সাধারণ লোকের উৎপন্ন শস্যে ভাগ বসাইত, আর তাহাদের বেগার খাটার মধ্য দিয়া নিজেদের কাজ সারিত। ক্রমে খণ্ডরাজ্যগুলির উপরে আসিল বিশাল সাম্রাজ্য, তাহাতে দেশের শক্তি সম্পদ বাড়ে, কিন্তু শোষণ কিছু কমে নাই। সম্রাট, পারিষদ, অমাত্য ইত্যাদির লাভের জন্যই চীনের বাণিজ্যের সূত্রপাত; এখানেও বণিকেরা শাসকদের আশ্রিত ভৃত্যের মতো। অতি প্রাচীনকালেই চীন রেশমের জন্য বিখ্যাত হয়; সেই সিল্‌কের জামা-কাপড় বড়োলোকদের পরিচ্ছদ ছিল, আর গরিবদের অনেক সময় খড় বুনিয়া জামা পরিতে হইত। সম্রাটের নামে দেশের সর্বত্র শাসন চালাইবার জন্য চীনে মাণ্ডারিন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়; লেখাপড়া, আত্মবিকাশের সুবিধা, আরামের জীবন তাহাদেরই আয়ত্তে থাকে। ধর্ম মানুষকে শিখাইল যে, সম্রাট দেবতার পুত্র, আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা সৎজীবনের আদর্শ, পুরোহিত এবং প্রধানদের নির্দেশ মানিয়া চলা সুনীতির মূলসূত্র।

সেই নির্দেশ বার বার সাধারণ লোককে দুরবস্থার মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়—তাই মাঝে মাঝে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। খৃস্টাব্দের প্রথম শতকে গোড়ার দিকে, আর দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে বিদ্রোহ সারা দেশে তোলপাড় আনে। চীনের দীর্ঘ ইতিহাসে বার বার সম্রাটবংশের বদল দেখা যায়, কিন্তু সাধারণ আর্থিক শোষণের বন্দোবস্তে কিছু কিছু পরিবর্তন আসিলেও তাহার প্রকৃতি একই রকম থাকে। সমস্ত এশিয়াটিক সমাজের ইতিহাসেই আমরা বহুদিন ধরিয়া আর্থিক ব্যবস্থার এই এক ভাব লক্ষ্য করি। প্রাচ্যদেশগুলিতে অনেক কাল পর্যন্ত সাধারণ লোকের জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের গতি

স্তব্ধ হইয়া থাকে। আধুনিক যুগের ধনতন্ত্রের তাড়নাতেই শেষ পর্যন্ত এশিয়াটিক সমাজ সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, যদিও চীনদেশেও কিছু পরিমাণে সামন্ত প্রথা ঐতিহাসিকেরা ধরিতে পারিয়াছেন।

ভারতীয় মার্কসবাদীর পক্ষে আমাদের দেশের ইতিহাস ভালো করিয়া পড়া উচিত। ঠিক সেই কারণে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তাহার কোনো স্থান নাই। এদেশেও নিশ্চয় বড়ো নদীগুলির কূলে সভ্যতার উদয় হইয়াছিল; সিন্ধু নদের ধারে মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পার ধ্বংসাবশেষ তাহার প্রাচীনতম চিহ্ন। আর্যেরা সম্ভবত আসিল তাহার পর। তাহারা প্রথমে আদিম সাম্যতন্ত্রের সমাজে বাস করিত, ভারতে বসতি বিস্তার করিতে করিতে তাহাদের মধ্যে সভ্যতা এবং তাহার আনুষঙ্গিক শ্রেণীভেদ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। ভারতীয় আর্য সমাজে শ্রেণীভেদ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল; বর্ণাশ্রম ঠিক শ্রেণীভেদ না হইলেও উভয়ের যোগ রহিয়াছে। সমাজের একদিকে পুরোহিত ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা ও রাজ্যশাসক ক্ষত্রিয়, ব্যবসায়ী বৈশ্য প্রভৃতি; তাহারা স্পষ্টতই নিজেদের পরিশ্রমে ধন উৎপাদন করিত না, অপরের উৎপন্ন দ্রব্যে ভাগ না বসাইলে তাহারা বাঁচিত কিরূপে? অন্যদিকে সাধারণ লোক, দেশের ধর্ম যাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া দাবাইয়া রাখিত। কোনো কোনো শূদ্র অবস্থাপন্ন হইলেও সমাজে তাহারা আশ্রিতের মতন, তাহাদের ক্ষমতা ও প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল। বিজিত জাতিদের সংখ্যাও নিশ্চয় কম ছিল না, তাহারা দাস ও পঞ্চম শ্রেণীতে পরিণত হয়।

ভারতীয় সংস্কৃতি ইতিহাসে গৌরবময়, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সমাজে শ্রেণীভেদ ও শোষণ অস্বীকার করা পাগলের প্রলাপ। প্রাচীন হিন্দুধর্মের একটি কীর্তি উল্লেখযোগ্য—কর্মফল এবং জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের প্রচলন শোষণের বন্দোবস্ত পাকা করিবার প্রবল উপায়। মানুষের সমাজে অবস্থার কারণ কর্মফল, প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাজ করিয়া যাওয়াই তাহার ধর্ম, এই-সব কথার নিগূঢ় তাৎপর্য আমরা এখন সহজেই বুঝিতে পারি। ভারত-ইতিহাসের মহৎ কীর্তি অগ্রাহ্য করিবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। সে-কথা আমাদের অতি-পরিচিত বলিয়াই এখানে তাহার বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ-লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, সংস্কৃতির উৎকর্ষ ও রাষ্ট্রিক কৃতিত্বের আড়ালে যে-শোষণপ্রথা শ্রেণী-বিভক্ত সভ্য সমাজ মাত্রে প্রকাশ পায় তাহার

দিকে চোখ ফেরানো। আগেকার ভারতের গৌরবে আমরা গর্ব অনুভব করি, সে অনুভূতি কিছু অন্যায় নয়। কিন্তু ইতিহাসে গভীরতম পরিবর্তন আসে আর্থিক বদলের মধ্যে, এই সমাজ-ব্যবস্থা অন্য সমাজের স্থান নেয় তাহারই চাপে।

সমাজের আর্থিক কাঠামোর দিকে দৃষ্টি পড়িলেই দেখি যে, সভ্যতার ইতিহাসে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত সর্বত্র রহিয়াছে বিভিন্ন শ্রেণী এবং সম্পত্তিবান শ্রেণী কর্তৃক সামান্যবিত্ত অথবা বিত্তহীন শ্রেণীর উপর শোষণের পাকা বন্দোবস্ত। সমাজতন্ত্রের আগে তাই সকল সভ্যতার মূলে বিরাজ করে শ্রেণী-বিরোধ। সমাজের মৌলিক বদলও আসিয়া থাকে শ্রেণী-সংঘাতের মধ্য দিয়া। মহান ভারতীয় সভ্যতার বেলা তাহার অন্যথা হইবার কোনো বৈধ কারণ দেখি না।

উপরতলার মানুষ ও নীচের তলার মানুষের মধ্যে তফাত ও শ্রেণীগত সম্পর্ক সম্বন্ধে চল্‌তি ইতিহাস-চর্চা একেবারেই উদাসীন। সর্বত্রই দেখি ঐতিহাসিকদের কারবার বাহিরের বিচিত্র প্রকাশ লইয়া, তাহার আড়ালে সমাজের মূলে যেন আলোচনার কিছুই নাই। এই লেখায় তাই জোর দিতে হইতেছে ইতিহাসের সেই অনাদৃত অবজ্ঞাত অথচ মৌলিক দিকের উপর। ভারতের রাষ্ট্রিক উত্থান-পতন, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-শিল্পকলা-ধর্ম-দর্শনের উৎপত্তি ও প্রসার, রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য—এই-সকল কথা বর্তমান আলোচনার মধ্যে আসিতে পারে না। ইহাদের স্থান স্বতন্ত্র, ইতিহাসের মূলধারা নির্ণয়ে এ-সব কথা অবান্তর।

গ্রীস ও রোমের দাস-প্রথা

ইওরোপে আদিম অসভ্য সমাজের রূপান্তর আরম্ভ হয় প্রথমে দক্ষিণ অঞ্চলে। এখানে প্রথম যে-সভ্যতার উদয় হইল তাহার লীলাভূমি গ্রীস ও রোম। পরিণত অবস্থায় তাহার আর্থিক গড়নের মূল রূপ—সম্পত্তিবানদের দাসগণের পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করা। কিন্তু এই দাস সমাজ ধীরে ধীরে গড়িয়া ওঠে, ইহার বিস্তার ও প্রকৃতি সব সময় এক রকম ছিল না। অল্প পরিসরের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ বর্ণনা অসম্ভব ; কাজেই এখানে ইহার ইতিহাসের সামান্য একটু নির্দেশ ভিন্ন উপায় নাই।

গ্রীক সভ্যতার উদয়ের আগে এই অঞ্চলের কোথাও কোথাও প্রাচীন এশিয়াটিক সমাজের অনুরূপ চিহ্ন পাওয়া যায়। ক্রীট দ্বীপ ও এশিয়া মাইনরের উপকূলে ট্রয় নগরীর সভ্যতা ইহার মধ্যে প্রসিদ্ধ। উত্তর হইতে আগত গ্রীকজাতি এগুলিকে ধ্বংস করে। ট্রয়ের পতন পুরাতন গ্রীক গাথা ও মহাকাব্যের প্রধান বিষয় ; ইহার স্মৃতি গ্রীকদের মনে চিরকাল উজ্জ্বল হইয়া ছিল।

গ্রীকরা যখন দক্ষিণে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে তখন তাহাদের মধ্যে শ্রেণীভেদ সবে শুরু হইয়াছে। ইহার আগে তাহাদের সমাজেও নিশ্চয় আদিম সাম্যতন্ত্রের প্রচলন ছিল। নূতন দেশজয়ের মধ্যে তাহাদের ভিতর সামরিক দলপতির আবির্ভাব হয়। জমি ভাগ করিয়া লইবার সময় প্রতি জনপদে প্রধান ও সাধারণ লোকের শ্রেণী-ভেদ স্পষ্ট হইয়া ওঠে। প্রধানেরা বেশি সম্পত্তির মালিক হইয়া বসিয়া নিজেদের অভিজাত, দেববংশীয় ও শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া দাবি করিত। প্রথম গ্রীক রাজারা শুধু এই সম্পত্তিবানদের নেতা মাত্র ছিল। প্রত্যেক গ্রীক উপজাতির মধ্যে রাজা বা নেতাকে ঘিরিয়া এক মন্ত্রণাসভা থাকিত, তাহাতে ছিল প্রধানদের প্রতিনিধিরা। আসল ক্ষমতা এই সভার হাতে ছিল তবে সাধারণ গ্রীকরাও ছিল স্বাধীন, তাহাদের দেওয়া হইত ছোটো ছোটো সম্পত্তি। হোমারের রচিত মহাকাব্যে আমরা এই ধরনের সমাজের পরিচয় পাই। এই অবস্থা ছিল খৃস্টের জন্মের হাজার বৎসর আগে।

যুদ্ধজয়ের মধ্যে অন্য দেশের মতো গ্রীসেও দাসপ্রথার আরম্ভ হয়। তবে দাসেরা তখন গ্রীক অভিজাতদের গৃহের কাজেই নিযুক্ত থাকিত। ধন উৎপাদনের আর্থিক ব্যবস্থায় দাসদের নিয়োগ তখন সবে মাত্র সামান্য ভাবে আরম্ভ হইয়াছে, দাস সমাজ গড়িয়া উঠিতে আরো পাঁচ-শত বৎসর লাগে। লোহার আবিষ্কার, লোহার অস্ত্র ও হাতিয়ার নির্মাণ তখন গ্রীকেরা শিখিতেছে; তাহার ফলে পরে দাসদের খাটানো ও দমন করা ক্রমশ সহজ হইয়া আসে। কিন্তু প্রথম হইতে এশিয়াটিক সমাজের সঙ্গে গ্রীক আর্থিক ব্যবস্থার কিছু তফাত দেখা যায়। গ্রীস অনুর্বর দেশ; চাষের কাজ, বিশেষত খাদ্যশস্যের উৎপাদন সেখানে ভালো চলিত না। গোরুভেড়ার পাল রাখা গ্রীকদের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল; পশুপালন গ্রীক সমাজের একটা বিশেষ কাজ। অভিজাতদের সম্পত্তির অনেকখানি ছিল এই পশুর পালে।

প্রথম হইতে গ্রীকদের ব্যবসা-বাণিজ্যেও মন দিতে হয়। এশিয়াটিক সমাজে বণিকেরা সাধারণত শাসকদের আশ্রিত ছিল, শাসকেরা নিজেদের ধনবৃদ্ধির কাজে তাহাদের লাগাইত। গ্রীসে কিন্তু সাধারণ অনেক লোককে ব্যবসা করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতে হইত, বাণিজ্যের বিস্তার হইল তাই অনেক বেশি। অল্পদিনের মধ্যে গ্রীক বণিকেরা তাই অনেকটা স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হয়—গ্রীক ইতিহাসে এক সময়ে দেখি এই বণিকেরা এমন-কি অভিজাতদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রীসে বাণিজ্য সম্ভব হইল নানা-রকম জিনিস প্রস্তুত করার সুবিধা থাকার জন্য। এদেশের পাহাড়ে জমিতে অনেক ধাতু পাওয়া গেল, তাহাতে অস্ত্র ও নিত্যব্যবহারের অন্য জিনিস তৈয়ারি হইতে থাকে; বিশেষ একরকম মাটি দিয়া গ্রীকরা চমৎকার বাসন গড়িতে লাগিল; তামা ও রুপা এবং তাহাতে নির্মিত দ্রব্য অন্য দেশে পাঠানো হইত; শ্বেত পাথর এবং মজবুত কাঠের অভাব ছিল না; অলিভ ফল ও তাহার তৈল অশেষ কাজে লাগিত। অন্য দেশে এই-সব চালান করিয়া বণিকেরা শস্য, মাছ ইত্যাদি আনিতে থাকে। বাহিরে পাঠাইবার জন্য জিনিস প্রস্তুতের কাজে অনেক কারিগর কাজ পাইল। নৌকা ও জাহাজ বানানোতে গ্রীকেরা পারদর্শী হইয়া ওঠে। এইভাবে গ্রীসে জমিদার ও চাষী ছাড়াও অন্য শ্রেণী, অর্থাৎ বণিক ও কারিগরদের প্রভাব দেখা যায়। তখন গ্রীক সভ্যতার আদিযুগ—দাসেরা প্রভুদের গৃহের কাজে ব্যস্ত,

সমাজের আর্থিক বন্দোবস্তে তখনো দাসেরা প্রধান নির্ভর হইয়া ওঠে নাই।

গ্রীক আদিযুগেও অবশ্য শ্রেণীভেদের সঙ্গে সঙ্গে শোষণের অন্যথা দেখি না। অভিজাতেরা গরিব চাষী ও গৃহদাসদের পীড়ন করিত—চাষীরা অনেকে বড়োলোকদের কাছে ধার করিয়া তাহাদের হাতে গিয়া পড়ে। এক সময় এথেন্সে প্রায় প্রত্যেক চাষীর জমিতে এক ধরনের লিখিত চিহ্ন দেখা যাইত, জমি কোনো বড়োলোকের কাছে বন্ধক আছে তাহার প্রমাণ এই চিহ্নগুলি। বণিকেরা ধনী হইয়া উঠিলেই কারিগরদের উপর খানিকটা জুলুম চালাইত। শ্রেণী-বিরোধে সমাজ যাহাতে ভাঙিয়া না যায় তাই গ্রীসেও ক্রমে রাষ্ট্রশক্তি দেখা দিল, মালিকদের স্বার্থ ও আত্মরক্ষার অন্য উপায় ছিল না। শ্রেণীভেদ ও শ্রেণী-বিরোধের ভিতর দিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সব চাইতে বিস্তৃত বিবরণ আমরা প্রাচীন এথেন্সের ইতিহাসে দেখিতে পাই।

গ্রীসে প্রাকৃতিক কারণে রাজ্যগুলি অত্যন্ত ছোটো ও সীমাবদ্ধ হয়—দেশজোড়া সাম্রাজ্য এখানে গড়িয়া উঠিল না। খণ্ড খণ্ড গ্রীক রাজ্যগুলি ইতিহাসে নগর-রাষ্ট্র অথবা পলিস নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই পলিস নাম হইতেই রাষ্ট্রনীতি বা পলিটিক্স্ কথার উৎপত্তি। এখানে শীঘ্রই রাজাদের সরাইয়া অভিজাতশ্রেণী নিজেরাই রাজ্যভার লইল—রিপাবলিক অথবা সাধারণতন্ত্রের উদয় হয় তখন। দেশে অভাবের জন্য গ্রীকদের বাণিজ্য ছাড়া আর-একটি অভ্যাস হয়—অপরকে জলপথে আক্রমণ ও লুটপাট। বলা বাহুল্য, সমুদ্রের কূলে ও দ্বীপে বাস করিয়া গ্রীকরা নৌকা জাহাজ বানাইতে ও সাগর পাড়ি দিতে ওস্তাদ হইয়া ওঠে। এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে বিদেশে ভালো ভালো খালি জায়গার সন্ধান পাইয়া তাহারা উপনিবেশ গড়িতে আরম্ভ করে। সারা ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ছোটো ছোটো গ্রীক-নগরীর পত্তন হইল। ইহাদের কলনি বা উপনিবেশ বলা হইত। প্রথমে এশিয়া মাইনরের উপকূলের গ্রীক-জনপদগুলি সব চাইতে প্রবল হয়—ইহাদের সাধারণ নাম ছিল আইওনীয়, সংস্কৃত যবন কথার উৎপত্তি এই নাম হইতে। পরে আসল গ্রীসের ঈজিনা, করিন্থ্ ও এথেন্স নগরী ব্যবসা-বাণিজ্যে ও নৌ-বলে এবং স্পার্টা অস্ত্রশক্তিতে প্রধান হইয়া ওঠে।

গ্রীক আদিযুগের শেষের দিকে প্রতি নগরীতে শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রবল-

রূপে দেখা দিল—একদিকে অভিজাত ও অবস্থাপন্ন চাষী ; অন্যদিকে ডিমস অর্থাৎ সাধারণ লোক, বণিক ও ব্যবসায়ীরা তাহাদের নেতৃস্থানীয়। সেকালের থিউকিডিডিস প্রভৃতি গ্রীক ঐতিহাসিকেরা এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অভিজাতেরা যে-যেখানে পরাস্ত হইল, এথেন্স প্রভৃতি সেই-সব নগরীতে এইবার ডিমক্রাসি বা গণতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। ইতিহাসে এই প্রথম রাষ্ট্রশক্তি জনসাধারণের হাতে আইন-অনুসারে ন্যস্ত হইল। পেরিক্লিসের সময়কার এথেন্স এইজন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

আসল অবস্থাটা কিন্তু একটু ভালো করিয়া বুঝিয়া দেখা দরকার। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তখন লোকের আর্থিক অবস্থা লইয়া মাথা ঘামাইত না, তাই গ্রীক সমাজে আর্থিক শোষণের ইহাতে কোনো অন্যথা হইল না। অভিজাতেরা চাষী ও দাসদের উপর, বণিকেরা কারিগরদের উপর, আগের মতোই অবাধে আর্থিক জুলুম চালাইতে থাকে। আর্থিক জোরের কল্যাণে বড়োলোক ও অবস্থাপন্ন লোকেরা নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখিল—ডিমস-এর দলও সাধারণত বণিকদের হাতে থাকে। তাহা ছাড়া গ্রীক গণতন্ত্রগুলিও এতদিনে দাসপ্রথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে আরম্ভ করে, অনেক রাজ্যে স্বাধীন লোকের চাইতে দাসদের সংখ্যাই ছিল অধিক ; এই দাসদের অবশ্য কোনোরকম অধিকার ছিল না এথেন্সের ডিমক্রাসি আসলে দাসতন্ত্র, এই সত্য কথাটুকু ভুলিলে চলে না।

গ্রীসের বহু অঞ্চলে আবার এই সীমাবদ্ধ গণতন্ত্রটুকুও স্থাপিত হয় নাই। স্পার্টার কথা ধরা যাইতে পারে। সেখানে স্পার্টার মুষ্টিমেয় স্বাধীন লোকের আর্থিক পরিশ্রমের বালাই ছিল না। তাহারা ছিল যোদ্ধা, তাহাদের জমি অন্যেরা চাষ করিয়া দিত, অন্যেরা তাহাদের খাওয়াপরা বিনামূল্যে জোগাইত। স্পার্টারাজ্যে উৎপাদনের পরিশ্রম ছিল হেলটদের উপর, ইহাদের দাবাইয়া রাখা হইত অস্ত্রের জোরে। হেলটদের বিদ্রোহ প্রায়ই স্পার্টার শান্তি ভঙ্গ করিত ; বিদ্রোহ দমন করিবার জন্যই স্পার্টার সামরিক আয়োজন সর্বদা মজুত ছিল। এই হেলটদের আমরা সার্ফ বা ভূমিদাস বলিতে পারি। স্পার্টা ও তাহার মিত্র পেলপনেসিয়ান রাজ্যগুলিতে অভিজাতদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে। অন্যদিকে এথেন্স নৌ-বলের জোরে সাম্রাজ্য গড়িল,

সেখানে আবার বণিকদের স্বার্থে আশ্রিত শহরগুলির উপর অনেক অত্যাচার চলে।

পরিণত গ্রীক সমাজে দাসপ্রথা আর সামান্য রহিল না, ক্রমে ক্রমে দাসেরাই সমাজের প্রধান আর্থিক অবলম্বন হইয়া ওঠে। স্বাধীন সাধারণ গ্রীকদের তখন আর বিশেষ প্রভাব থাকিল না। যুদ্ধে পরাজিত গ্রীকরাও তখন দাসত্বে শৃঙ্খলিত হইতে থাকে, বিদেশ হইতে হাজার হাজার দাস বণিকেরা কিনিয়া আনে। এই দাসেরা আর শুধু তখন গৃহের কাজে আবদ্ধ নয়, উৎপাদনের নানা কাজে তাহাদের লাগানো হইত। খনিগুলি চলিতে থাকে দাসদের হাড়-ভাঙা খাটুনিতে ; জাহাজ তৈয়ার হইত তাহাদের পরিশ্রমে ; মন্দির নির্মাণের কাজে তাহাদের নিয়োগ দেখি ; বড়োলোকদের জমি ও বাগানে তাহারা খাটিতে লাগিল ; মাটির বাসন, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির কারখানাতে দাসদের নিয়োগ করা যায়। কোনো কোনো গ্রীক কারখানায় শতাধিক দাস কাজ করিত ; তখনকার দিনে এগুলিকে প্রকাণ্ড কারখানাই বলা যায়। খৃস্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতকে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে সাধারণ স্বাধীন গ্রীকদের সর্বনাশ হইল। দাস-পরিশ্রম সমাজের আর্থিক কাঠামো হইয়া দাঁড়ায় এইভাবে। ইতিহাসে ইহাই প্রথম দাস সমাজ। গ্রীসের গৌরবের যুগে গ্রীক পণ্ডিতেরা দাসত্বকে প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আরিস্টটল বলিলেন যে, অনেক মানুষের জন্মই দাসত্ব করিবার জন্য। ইতিহাসে বারবার দেখা যায় যে, কোনটা স্বাভাবিক, মানুষের সে-ধারণার উৎপত্তি হয় প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থা হইতে।

নিষ্পেষিত দাসদের বিদ্রোহ গ্রীক সমাজে শান্তিভঙ্গ করিতে থাকে, খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ততদিনে যুদ্ধবিগ্রহে ছোটো রাজ্যগুলির শক্তি নষ্টপ্রায় ; এথেন্স ও স্পার্টার ক্ষমতার অবসান হইয়াছে। সমাজ ভাঙিয়া পড়ার উপক্রম হওয়াতে অনেক গ্রীকের মনে হইতে লাগিল যে, শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উদয় না হইলে সর্বনাশ। মাসিডোনিয়ার নূতন সামরিক শক্তির দিকে তাহাদের চোখ ফিরিল। গ্রীক সম্পত্তিবান লোকদের সাহায্যে মাসিডোনের রাজা ফিলিপ খণ্ডরাজ্যগুলিকে নিজের সাম্রাজ্যের বন্ধনে যুক্ত করিলেন। তাহার পর নূতন দেশ দখল করিয়া গ্রীক সমাজকে

আবার শক্তিশালী করিবার সংকল্প আসিল। ফিলিপের পুত্র আলেক্‌জাণ্ডার সুবিশাল পারস্য সাম্রাজ্য জয় করিলেন।

আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য তিনভাগ হয়। গ্রীসদেশ পড়ে মাসিডোনিয়ার ভাগে; এ-অঞ্চলে পুরাতন দাসপ্রথা চলিতে থাকে। গ্রীক টলেমি বংশ মিশরে নূতন রাজ্য গড়ে। পশ্চিম এশিয়া সিরিয়া সাম্রাজ্য নামে সেলিউকাস-বংশীয় গ্রীক রাজাদের হাতে আসে। মিশর ও সিরিয়া সাম্রাজ্য পুরাতন এশিয়াটিক সমাজকেই বাঁচাইয়া রাখে—তাহাদের উপর শুধু গ্রীক সভ্যতার একটা বাহিরের পালিশ পড়ে। ইতিহাসে এই সময়টিকে হেলেনীয় যুগ বলা হয়। তাহার পর রোম সাম্রাজ্য পূর্বদিকে প্রসারিত হইতে আরম্ভ হয়। ততদিনে গ্রীস ও মাসিডোনিয়ার দাস সমাজে আবার সংকট দেখা দিয়াছে। সম্পত্তিবান লোকেরা রোমের সুবিখ্যাত সামরিক শক্তির আশ্রয় খুঁজিল দাসদের উপর কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার লোভে। রোমানরা গ্রীস ও মাসিডোনিয়া দখলের পর হেলেনীয় রাজ্যগুলিও জয় করে, কিন্তু সে-অঞ্চলের এশিয়াটিক সমাজ মোটামুটি আগের অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। মিশর ও সিরিয়া হইতে রোম কর আদায় ও লুণ্ঠন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত।

গ্রীকদের ও পরবর্তী হেলেনীয় যুগের সংস্কৃতি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। ফিনিসীয় বণিকদের অক্ষরমালা বদল করিয়া তাহারা ইওরোপে লিখিবার পদ্ধতি চলন করিল। হোমারের মহাকাব্য হইতে ইওরোপীয় সাহিত্যের সূচনা। গ্রীক নাটক, ইতিহাস, কবিতা আমরা এখনো উপভোগ করিতে পারি; আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইয়াছে, কিন্তু গ্রীক সাহিত্যের আদর কমে নাই। গ্রীক শিল্পের অসাধারণ সৌন্দর্য ও মাত্রাজ্ঞান প্রকাশ পায় মূর্তি গড়ায় ও মন্দির ইত্যাদির নির্মাণে; মাটির বাসনেও দেখা গিয়াছিল আশ্চর্য কৃতিত্ব। গ্রীক দর্শন হইতে ইওরোপীয় চিন্তাধারার আরম্ভ। পিথাগোরাস শুরু করেন গণিত, দর্শন ও সংগীত শাস্ত্রের আলোচনা। সক্রেটিস ও প্লেটো ভাববাদের প্রচলন করেন; অন্যদিকে ডিমক্রিটাস্‌কে প্রথম পশ্চিমী বস্তুবাদী দার্শনিক বলা চলে, আর হেরাক্লাইটাস জগৎ চির-পরিবর্তনশীল বুঝিতে পারেন। চিন্তাশীল সোফিস্টরা সকল কথা বিচার এবং সব সাধারণ বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করেন। রাষ্ট্রনীতি চর্চা ও তাহাতে ব্যবহৃত শব্দগুলি অনেকাংশে গ্রীকদের

সৃষ্টি। মানুষের সকল বিদ্যা এবং চিন্তার প্রণালীকে পর্যন্ত আরিস্টটল সুসংবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। আইওনীয় পণ্ডিতেরা বিশ্বসংসারকে অলৌকিক রহস্য মনে না করিয়া প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে তাহার গড়নের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—পশ্চিমে বিজ্ঞানের এই প্রথম অধ্যায়। লিউকিপাস বলিলেন যে, সমস্ত বিশ্ব অতি ক্ষুদ্র অণুর সমষ্টি। হিপোক্রাটিস করিলেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গোড়া পত্তন। হিপার্কাস পশ্চিমে জ্যোতিবিদ্যার জনক। এথেন্সে প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার প্রথম চেষ্টা হয়। হেলেনীয় যুগের আলেকজান্দ্রিয়া বিদ্যার কেন্দ্র হইয়াছিল—সেখানকার গ্রন্থাগার জগদ্‌বিখ্যাত। ইউক্লিড জ্যামিতির বিধি-বিধান সৃষ্টি করেন; আর্কিমিডিস করেন ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার চর্চা; আরিস্টারকাস বলিলেন পৃথিবী সূর্যের চারিধারে ঘুরিতেছে; এরাটোস্থিনিসের মত ছিল যে, পৃথিবী গোলাকৃতি।

গ্রীক সংস্কৃতির এই আশ্চর্য উৎকর্ষের মূলে বণিকবৃত্তির প্রসার, কারবার ও কারখানায় উন্নতির সন্ধান, সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা, দেশ-বিদেশের সঙ্গে পরিচয় রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্থিতিশীল অভিজাত ও চাষী লইয়া গঠিত সমাজে এমন সর্বাঙ্গীণ সংস্কৃতি সম্ভব ছিল না। অবশ্য গ্রীক সমাজে অভিজাতদের অভিমান, এবং চাষী, কারিগর ও দাসদের শোষণ খুব বড়ো কথা। সংস্কৃতিতে সেদিকটাও স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আরিস্টটল নির্মমভাবে দাসত্বকে প্রকৃতির বিধান বলিলেন; প্লেটো দৈহিক পরিশ্রমে ধন উৎপাদনকে অবজ্ঞা করিতে শিখাইলেন। গ্রীক সমাজে নারীর সমাদর ছিল না। সাধারণ লোককে ভুলাইয়া রাখিতে ধর্মের উন্মাদনা ডায়োনিসাস পূজা ও অন্যান্য কুসংস্কারে দেখিতে পাই। বিজ্ঞানের উন্নতি ও আবিষ্কারকে মানুষের কাজে লাগানো তাই দাসতন্ত্রের মধ্যে সম্ভব হইল না। মুক্তির আদর্শকে সম্পত্তিবানদের স্বার্থের কাছে বারবার খর্ব করা হয়। দাসপ্রথাই অনেক দিকে গ্রীক সংস্কৃতির কণ্ঠরোধ করে।

দাস সমাজের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব রোমে। ইটালিতে আদি-যুগে গ্রীক নগরীরাষ্ট্রের মতন খণ্ড খণ্ড রাজ্য চারিদিকে গড়িয়া ওঠে—তাহার মধ্যে এট্রুরিয়ার নগরগুলি বিখ্যাত। উত্তরে এট্রুরিয়া, দক্ষিণে ইটালির পায়ের কাছে এবং সিসিলি দ্বীপে গ্রীক উপনিবেশ-সমূহ—এই দুইয়ের মাঝখানে লাটিন জনপদগুলি ইতিহাসে দেখা

দিল, রোম তাহাদের মধ্যে প্রধান। খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতকে রোমের ইতিহাস আরম্ভ। লাটিন জাতির মধ্যে এই সময় আদিম সাম্যতন্ত্র ভাঙিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইতেছে। রোমেও দেখি রাষ্ট্রের গঠন আসিল শ্রেণীভেদ ও শ্রেণী-বিরোধের ভিতর দিয়া।

রোমের অভিজাত শ্রেণীর নাম ছিল প্যাট্রিসিয়ান। তাহারা অনেকখানি করিয়া ভালো জমি দখল করিয়া বসে। রোমে প্রাচীন নিয়ম অনুসারে কিছুটা খালি জমি পড়িয়া থাকিত, সেটা ছিল সাধারণের সম্পত্তি, প্রয়োজন হইলে যে-কোনো রোমান তাহার খানিকটা নিজের জন্য চাষ করিত। কিন্তু বেশি জমি চাষ করিতে গেলে বেশি লাঙল, বলদ, লোকজন, বীজ ইত্যাদি লাগে ; প্যাট্রিসিয়ানদেরই শুধু সে সংস্থান ছিল, কাজেই সাধারণের জমি আসলে ভোগে আসিল শুধু তাহাদের। গরিব রোমানেরা তাহাদের কাছ হইতে দরকার হইলে ধার পাইত ; ধার শোধ করিতে না পারিলে সেকালের এথেন্সের মতন রোমেও নিয়ম ছিল যে ঋণীরা ঋণদাতাদের অধীন হইয়া পড়িবে। এইভাবে প্রধানদের অনুগত আশ্রিত-শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

প্যাট্রিসিয়ানরা যুদ্ধজয় প্রভৃতির ফলে কিছু কিছু দাস সংগ্রহ করিতেও আরম্ভ করে। তবে গ্রীসের মতন রোমেও আদিযুগে দাস-প্রথা সমাজের প্রধান আর্থিক অবলম্বন হইয়া ওঠে নাই। প্যাট্রিসিয়ানদের আশ্রিত লোকেরা কিছু ব্যবসা-বাণিজ্যও আরম্ভ করে, লাভের বেশির ভাগটা অবশ্য প্রভুশ্রেণীর প্রাপ্য ছিল। এই প্যাট্রিসিয়ানরা প্রথমে রাজতন্ত্রের সৃষ্টি করে ; কিছুদিন পরে রাজাকে তাড়াইয়া রোম রিপাবলিক হইল, অভিজাতেরা তখন নিজেদের হাতে সমস্ত রাজ্যভার রাখিল। রোমে অভিজাতদের মন্ত্রণাসভার নাম সেনেট। প্রতি বৎসর দুইজন করিয়া প্রধান অধ্যক্ষ হইত, তাহাদের নাম ছিল কন্সাল। সৈন্যদল অভিজাতদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বে রহিল। রোমরাজ্যের প্রাচীন ব্যবস্থা ছিল এই।

সাধারণ লোকের মধ্যে অনেকে ক্রমে ক্রমে একেবারে সম্পত্তি-হীন হইয়া পড়ে, তাহাদের পুরাতন নাম প্রলেটারিয়াট আজ সারা জগতে বিত্তহীন সর্বহারা শ্রেণীর নাম। প্রলেটারিয়াট ছাড়াও অনেক সামান্য অবস্থার লোক রোমান সমাজে দেখা যায়—গরিব চাষী, স্বাধীন সাধারণ বণিক ইত্যাদি। অভিজাত ছাড়া অন্য সকল শ্রেণীর ব্যাপক নাম হইল প্লেবিয়ান। ইহার মধ্যে অবশ্য প্রলেটারিয়াটের

বিশেষ কিছু শক্তি ছিল না। যীশুর জন্মের আগের পঞ্চম ও চতুর্থ শতকে, প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের শ্রেণী-বিরোধ রোমের ইতিহাসের প্রধান কথা। রোমে কিন্তু গ্রীসের মতন গণতন্ত্র আসিল না; স্বাধীন বণিকশ্রেণী, কারিগর ইত্যাদির আর্থিক ক্ষমতা রোমে বেশি প্রবল হইয়া ওঠে নাই। অবস্থাপন্ন প্লেবিয়ানদের কিছু কিছু অধিকার ছাড়িয়া দিয়া রোমে অভিজাতেরা নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখে; ঠিক হইল একজন প্লেবিয়ান কন্সাল থাকিবে, তাহার কাজের মেয়াদ ফুরাইলে সে সেনেট সভার সভ্য হইবে, ধার শোধ না করিতে পারিলেও রোমানদের আর দাস করিয়া ফেলা হইবে না, ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, অবস্থাপন্ন প্লেবিয়ানরা এই-সব নিয়মে খুশি হইয়া দল ভাঙিয়া অভিজাতদের সঙ্গে সহযোগ করে, কিন্তু একেবারে নিম্নস্তরের লোকদের উপর শোষণের বেশি-কিছু বদল দেখা গেল না। অভিজাতদের জব্দ করিবার জন্য প্লেবিয়ানরা সাধারণ সভা গড়িয়াছিল, তাহার নেতা হিসাবে ট্রিবিউন পদের সৃষ্টি হয়। প্যাট্রিসিয়ানদের সঙ্গে অবস্থাপন্ন প্লেবিয়ানদের রফার পর সাধারণ সভা ও ট্রিবিউনরা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। রোমান রাষ্ট্রে ও সমাজে অভিজাতদের ক্ষমতাই তাই টিকিয়া গেল।

সাধারণ লোকের অসন্তোষ ঢাকিবার জন্যই মনে হয় রোমের রাজ্যজয়ের আরম্ভ। অন্য জাতি ও দেশকে লুণ্ঠন করিয়া, তাহাদের অধীন অবস্থায় রাখিয়া, লুটের সামান্য ভাগ সাধারণ লোককে দিয়া, অধিকাংশ নিজেরা আত্মসাৎ করিয়া অভিজাত রোমানরা সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলে। অবশ্য এই সাম্রাজ্যে বহুদিন পর্যন্ত সম্রাট ছিল না। কারণ শাসক রোম নগরী বহুকাল শাসনতন্ত্রে রিপাবলিক থাকিয়া যায়। প্রথমে এট্রুরিয়া জয় করা হইল, রোমের হাতে তখন অনেক ধাতু সম্পদ আসিল; ইহার পর সমস্ত রোমান সৈন্যদলকে লোহার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করা সম্ভব হয়, রোমের যুদ্ধবল অনেক বাড়িয়া যায়। সাম্‌নাইট যুদ্ধের পর অন্য লাটিন জনপদগুলি রোমের অধীন হইল, উত্তর ছাড়া সমস্ত ইটালি এখন রোমের পদানত হয়। পরাজিত দেশের বিশিষ্ট বড়োলোকদের রোমানরা কিছু কিছু অধিকার দিয়া হাতে রাখিত, রোমের সাহায্যে তাহারা স্বদেশের সাধারণ লোকদের দাবাইয়া রাখে। সাম্রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রোমের আদি যুগ শেষ হইল। দেশজয়ের ফলে অসংখ্য দাস

রোমানদের হাতে আসিতে থাকে। গ্রীসের মতন রোমেও এবার আর্থিক বন্দোবস্তে দাসদের পরিশ্রম বাড়িয়া চলিল, দাস সমাজ গড়িয়া উঠিল।

তাহার পর আসিল রোমের দিগ্‌বিজয়ের পালা। প্রতিদ্বন্দ্বী কার্থেজ নগরীর অভিজাত ও বণিকদের পরাস্ত করিয়া, রোম সাম্রাজ্য সিসিলি, স্পেনদেশ ও উত্তর আফ্রিকার উপকূলে ছড়াইয়া পড়ে খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষে। তাহার পরের শতকে আসিল মাসিডোনিয়া ও গ্রীস অধিকার, ইহার পরের শতাব্দীতে পূর্বদেশের হেলেনীয় রাজ্যগুলি জয় করা হয়। রোমান সাম্রাজ্য সমস্ত ভূমধ্য-সাগরের চারিপাশের দেশগুলি শাসন করিতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সাম্রাজ্য ভাগ হইল। অস্ত্রশক্তি ও শাসন-ব্যবস্থার জোরে সারা সাম্রাজ্যে শান্তিরক্ষা হয়, তবে বিজিতদের লুণ্ঠন করা রোমান শাসনের একটা প্রধান দিক। প্রদেশগুলি হইতে প্রচুর রাজস্ব আদায়ের মধ্য দিয়া লুণ্ঠনের বিস্তার হয়। ধন উৎপাদনের ব্যাপারে দাসদের নিয়োগ এইবার সর্বব্যাপী হইল। রোমান সাম্রাজ্য তাই দাসপ্রথার পরিপূর্ণ বিকাশ।

দাসদের পরিশ্রমে এখন রোমান সাম্রাজ্যের সমস্ত খনিগুলি চলিতে থাকে। অভিজাত ও বড়োলোকেরা সাম্রাজ্যের সর্বত্র বড়ো বড়ো জমিদারি গড়িয়া তোলে, এইগুলিকে লাটিফাণ্ডিয়া বলা হয়, গ্রীকদের আমলে এ-ব্যবস্থা বেশি বিস্তৃত হয় নাই। এখানে চাষের কাজ দাসেরা করিতে থাকে। সাধারণ স্বাধীন চাষীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই জমিদারদের অধীন প্রজা হইয়া শোষণের চাপে দিন কাটাইতে থাকে। ইটালির চাষীরা তরকারী ও ফলের বাগানের কাজে সামান্য আয় করিতে লাগিল, প্রধান খাদ্যশস্য আসিতে থাকে প্রদেশগুলি হইতে। জমিহীন প্রলেটারিয়ানরা একেবারে বড়োলোকদের মুখাপেক্ষী হইল; তাহাদের মধ্য হইতে সাম্রাজ্যের সাধারণ সৈনিক সংগ্রহ করা হইত; মাঝে মাঝে উদ্‌বৃত্ত শস্য বিলাইয়া তাহাদের হাতে রাখা হইত; রোমে সার্কাস, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয় এই সাধারণ লোকদের তামাসা দেখাইয়া খুশি রাখিবার জন্য। মাঠের কাজে হাজার হাজার হতভাগ্য দাসদের খাটানো হইল, প্রভুদের কর্মচারীরা চাবুক ও লাঠি চালাইয়া ইহাদের কাজের তদারক করিতে থাকে। বড়োলোকদের দাসদের মাঝে মাঝে

অন্যের কাছে ভাড়া খাটাইবার ব্যবস্থাও দেখিতে পাই। অস্ত্র ও সকল রকম হাতিয়ার প্রস্তুত করিতেও দাসদের পরিশ্রম করিতে হয়। কোনো কোনো দাসকে কেরানি প্রভৃতির কাজেও লাগানো হইত। একদিকে প্রদেশগুলির সাধারণ লোকদের কাছ হইতে প্রচুর কর ও রাজস্ব আদায়, অন্যদিকে অসংখ্য দাস খাটানো, মহান রোমান সাম্রাজ্যের আর্থিক গড়ন ছিল এই ধরনের।

দাসবিদ্রোহ রোমান সাম্রাজ্যে বার বার ঘটিয়াছিল, তাহাতে দাসদের জয় হয় নাই, কিন্তু সমাজ দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। এশিয়া মাইনর ও সিসিলিতে বহুদিন ধরিয়া দাস-বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ চলে। যীশুর জন্মের ৭৩ বৎসর আগে ইটালিতে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে যে-দাসবিদ্রোহ হয় ইতিহাসে তাহারই খ্যাতি সব চাইতে বেশি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীতে শ্রমিক-বিপ্লবের যে-চেষ্টা হয় তাহার নেতা রোজা লুক্সেমবুর্গ ও কার্ল্ লাইবনেখ্ট্ নিজেদের দলকে স্পার্টাসিস্ট্ নাম দিয়াছিলেন এই প্রাচীন বিপ্লবীদের স্মৃতিতেই।

রোমে অভিজাতদের মধ্যে গৃহবিবাদ অবশেষে রিপাব্লিকের পতন আনিল। এই যুদ্ধবিগ্রহে সেনাপতিরা সর্বেসর্বা হইয়া পড়ে। বিত্ত-হীন প্রলেটারিয়ানদের ভাড়াটে সৈনিক করিয়া অনেক সেনাপতি নিজের নিজের দল গঠন করিতে থাকে। সাম্রাজ্যে শান্তিরক্ষা এবং দাস সমাজকে বজায় রাখিবার জন্য অভিজাতেরা মনে করিল যে, ডিক্টেটরী একনায়কত্বের দরকার হইয়াছে। এইভাবে সীজারদের নেতৃত্বে রোম রিপাব্লিক সাম্রাজ্যে পরিণত হইল। লাটিন সম্রাট কথাটির আসল অর্থ হইল প্রধান সেনানায়ক, সৈন্যবাহিনীই ছিল সম্রাটদের প্রধান নির্ভর। নামে স্বেচ্ছাচারী হইলেও কিন্তু সম্রাটদের প্রধান কাজ হইল দাসদের মালিকশ্রেণীর স্বার্থে অস্ত্রবলে সমাজকে বাঁধিয়া রাখা।

গ্রীকদের সংস্কৃতি রোমে আসিয়া আরো বিস্তার লাভ করে। কিন্তু গ্রীকদের তুলনায় রোমানদের এদিকে তত বেশি কৃতিত্ব দেখা যায় না। রোমের সমাজে বণিক ও স্বাধীন কারিগরদের বৃত্তির বেশি প্রসার ছিল না, স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞান তাই এখানে বেশি স্ফূর্তি লাভ করে নাই। রণকৌশল, সাম্রাজ্য-শাসনের ব্যবস্থা, আইন-কানুনের সৃষ্টি, প্রাসাদ ও শহর নির্মাণ, পয়ঃপ্রণালী, রাস্তাঘাট বানানো—

রোমানদের প্রধান কীর্তি এই-সব। সাধারণ লোকের মধ্যে নানা-রকম পূজা আচার এবং কুসংস্কার ছড়াইয়া পড়ে. লোকেরা শোষণে পীড়িত হইয়া তাহার মধ্যে খোঁজে আশ্রয় ও সান্ত্বনা।

সাম্রাজ্যের উদয়ের পর খৃস্টধর্ম ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সেকালের দেবদেবীর অর্চনার চাইতে এ-ধর্ম উন্নততর ছিল ; লোকের মনকে এই ধর্ম বেশি তৃপ্তি দিল ; প্রথম সম্রাটদের উৎপীড়নের মধ্যে খৃস্টানদের সাহস, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক খৃস্টধর্মকে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করিল। রোমানরা নূতন ধর্মটিকে দাসদের ধর্ম বলিয়াছিল, কিন্তু খৃস্টধর্ম দাসদের বিপ্লব শিখায় নাই। খৃস্টান পাদ্রিরা সাধারণ লোকদের কষ্টের মধ্যে নূতন সান্ত্বনার সন্ধান দিল, পৃথিবীর দুঃখের সমাধান হইবে স্বর্গরাজ্যে এই বিশ্বাসের প্রচার করিল। মানুষকে তাই ধর্মজীবনে মন দিতে হইবে ; ধর্মনীতির একটা প্রধান কথা নিজের অবস্থাকে মানিয়া লইয়া বিনীত থাকা, রাজা ও সমাজের অত্যাচার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করা, সংসারের অবিচারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরলোকের ভাবনায় মনোনিবেশ করা। খৃস্টধর্ম তাই লাঞ্ছিত অবনত শ্রেণীদের ভুলাইয়া রাখিবার কাজেই নিযুক্ত হইল, রোমান সমাজে শোষণের সহায়রূপেই শেষ পর্যন্ত এই ধর্মপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে। কিছুদিন পরে সম্রাট ও শাসকেরা তাই নূতন ধর্মকে আদর করিয়া গ্রহণ করিল।

ক্রমে রোমের দাসতন্ত্রের আয়ু ফুরাইয়া আসে। দাসপ্রথায় আর্থিক উন্নতির বিশেষ অবকাশ নাই, নূতন নূতন দাস সংগ্রহের পথও বন্ধ হইয়া আসিল। শোষণের ফলে সকল দেশ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছিল. ধন উৎপাদনের পরিমাণ দাস সমাজে কমিতে লাগিল। রোমান সাম্রাজ্যের শেষ যুগে বহু অঞ্চলে বৎসরের পর বৎসর বিদ্রোহ ও অরাজকতার বন্যা বহিয়া যায়, সেই অশান্তির মূলে দাস ও অন্য শোষিত শ্রেণীর অসন্তোষ যে প্রধান কথা তাহা আমরা এখন বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি। বাহির হইতেও অসভ্য টিউটনরা সাম্রাজ্যে লুটপাট আরম্ভ করে। রোমের অভিজাত শ্রেণীর শক্তি ফুরাইল। সাম্রাজ্যের শেষযুগে তাই দাসপ্রথা ভাঙিয়া পড়িয়াছে দেখা যায়। বড়ো বড়ো জমিদারি দাসদের খাটাইয়া আর ভালো চলিতেছিল না। টুকরা টুকরা জমিতে ছোটো ছোটো চাষী বসাইয়া চাষের কাজ তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া উৎপন্ন দ্রব্যে ভাগ বসাইবার রীতি এখন দেখা গেল।

মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের ইহাই পূর্বাভাস। ইতিমধ্যে টিউটন আক্রমণে পশ্চিমের রোম সাম্রাজ্যের অবসান হইল। ইওরোপে দাস সমাজের শেষ এইখানে।

ফিউডাল সামন্ততন্ত্র

পশ্চিম ইওরোপে দীর্ঘ দিন বিশৃঙ্খলা ও গণ্ডগোলের পর এবার সামাজিক জীবনের যে-পুনর্গঠন হইল, তাহাকে ফিউডাল নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাকেই সামন্তপ্রথা বলা হয়; এশিয়াটিক সমাজের প্রাচীন সভ্যসমাজের সঙ্গে ইহার কিছু মিল, আবার অনেক কিছু তফাত আছে। ফিউডাল সমাজের উৎপত্তির দুইটি ধারা দেখা যায়। একদিকে রোমান সাম্রাজ্যে দাসপ্রথা অচল হইয়া পড়িতে থাকে, নূতন আর্থিক বন্দোবস্ত এখানে-ওখানে মাথা তুলিতে আরম্ভ করে। অন্যদিকে উত্তর হইতে টিউটন জার্মানরা ইওরোপের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, তাহাদের আদিম অসভ্য অবস্থা কাটিয়া গিয়া নূতন যে-সামাজিক ব্যবস্থা দেখা দিল তাহাতেও দেখি সামন্তপ্রথার সূত্রপাত। ফিউডাল সমাজের পূর্ণ প্রকাশ হইল খৃস্টের জন্মের প্রায় হাজার বৎসর পরে। চৌদ্দ শতক পর্যন্ত তাহার প্রভাব পশ্চিমে প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। তাহার পর পশ্চিম ইওরোপে সমাজের চেহারা যখন বদলাইতে লাগিল, তখন ফিউডাল সামন্তপ্রথা পূর্ব ইওরোপে নূতন জীবন লাভ করে। সেখানে তাহার উচ্ছেদ হয় মাত্র এই সেদিন।

খৃস্টীয় তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। দাসপ্রথায় উৎপাদনের শক্তি কমিয়া আসিল, সাম্রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া আসে, চারিদিকের আর্থিক অবস্থায় স্পষ্ট অবনতি দেখা গেল, দাসদের অসন্তোষ ও বিদ্রোহে সমাজ হইয়া পড়িল দুর্বল। পূর্ব ও পশ্চিম প্রদেশগুলির মধ্যে আর্থিক বন্ধন এত ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে, সাম্রাজ্যকে দুইভাগ করিয়া ফেলা সম্রাটেরা বুদ্ধির কাজ মনে করিলেন; দুইটি পৃথক সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল রোম এবং বাইজান্টিয়াম বা কন্স্টান্টি-নোপল নগরী। পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যে আর্থিক সম্পদের তখনো বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, ব্যবসা-বাণিজ্য মোটের উপর একরকম চলিতে থাকে; সেখানে খানিকটা দাসপ্রথা বজায় রাখিয়া, খানিকটা আগেকার এশিয়াটিক সমাজের সংস্কার করিয়া, বাইজান্টাইন সভ্যতা আরো কয়েক শতাব্দী টিকিয়া গেল।

পশ্চিমে ভাঙন আসিল অনেক তাড়াতাড়ি। জমিদারদের বড়ো লাটিফাণ্ডিয়াগুলিতে দাসদের খাটাইয়া শস্য উৎপাদনে অনেক বাধা দেখা দিল, দাসদের অবাধ্যতা ছাড়াও উৎপন্ন জিনিস বাজারে চালানো এবং তাহা বিক্রয় করিয়া লাভের পথ আর সহজ ছিল না। সম্রাটের শক্তি কমিয়া আসাতে দেশময় অরাজকতা আসে; পশ্চিম-রোমান সাম্রাজ্যে তাই প্রত্যেক অঞ্চলকে আর্থিক ব্যাপারে নিজের উপর নির্ভর করিতে হইল। এই সময় দেখি জমিদারেরা প্রকাণ্ড জমিদারি-গুলি টুকরা টুকরা কাটিয়া তাহাতে প্রজা বসাইতেছে, সাক্ষাৎভাবে জমিতে দাস পরিশ্রমে চাষ না চালাইয়া ছোটো চাষীদের উৎপন্ন শস্যাদিতে ভাগ বসানো তাহাদের কাছে বেশি সুবিধা মনে হইতেছে। ছোটো চাষীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেল, দাসদের মধ্যে অনেককে মুক্তি দিয়া চাষী বানানো হয়। এই ছোটো চাষীরা জমিদারের আশ্রিত হইল, তাহাদের পরিশ্রমের ভাগ লইয়া বড়োলোকেরা থাকিতে লাগিল। খাওয়া-পরা জোগাইয়া অসংখ্য দাস রাখার আর সার্থকতা রহিল না। অবশ্য নূতন চাষীরাও শোষিত হইত, তাহারাও সুবিধা পাইলে বিদ্রোহ করিত। তৃতীয় শতকের শেষের দিকে ফ্রান্সে অনেক দিন প্রজাবিদ্রোহ চলে।

উত্তর হইতে তখন জার্মান জাতিগুলি আঘাতের পর আঘাতে রোম-সাম্রাজ্যকে দুর্বল করিয়া দেশ দখল করিতেছিল। খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষে তাহাদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা রোমান ঐতিহাসিক টাসিটাসের লেখায় পরিচয় পাই। তাহাদের মধ্যে শ্রেণী-ভেদ তখন সবে দেখা দিতেছে; স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তাহারা এত-কাল আদিম সাম্যতন্ত্রের জীবন যাপন করিয়া আসিতেছিল। শিকারী জীবন ছাড়িয়া কৃষিকার্যের মধ্য দিয়া তাহাদের এই পরিবর্তন আসে। তাহার পর রোমান সাম্রাজ্য জয় করিতে করিতে তাহারা সভ্য হইল, তাহাদের মধ্যে রাজা দেখা দিল, প্রধানদের ক্ষমতা বাড়িয়া চলিল, সাধারণ লোকের স্বাধীনতা কমিতে থাকিল। নূতন দেশ জয় করিয়া জার্মানরা এই প্রথম রাষ্ট্র গড়ে। তাহাদের মধ্যে সেকালের বংশ ও আত্মীয়তার বন্ধন আল্‌গা হইয়া গেল। জার্মান বড়োলোকেরা নিজেদের স্বজাতীয় সাধারণ লোক ও বিজিত প্রজাদের উপর সমান ভাবেই আধিপত্য বিস্তার করে। ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বিজয়ী নবা-গতেরা আগেকার লোকদের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে মিশিয়া যায়। মেশার

ফলে পশ্চিম ইওরোপের বর্তমান জাতিগুলির আরম্ভ হইল। রোমানদের দেখাদেখি জার্মানরা সকলেই খৃস্টান হইয়া যায়।

জার্মানরা দাসপ্রথায় বিশেষ অভ্যস্ত ছিল না, তাহারা যখন দক্ষিণে আসে তখন রোমানদের দাস-সমাজও ভাঙিয়া পড়িতেছে। জমিদার হইয়া বসিয়া তাই জার্মান প্রধানরা দাস না রাখিয়া ছোটো চাষীর পরিশ্রমে ভাগ বসানোই সুবিধা মনে করিল। সাধারণ জার্মান যোদ্ধারা মাঝে মাঝে স্বাধীন চাষীর গ্রাম গড়িল বটে—এইগুলিকে মার্ক্ বলা হইত—কিন্তু কিছুকাল পরে এই-সব গ্রামও জমিদারদের হাতে গিয়া পড়ে। অষ্টম হইতে দশম শতকে সুদূর উত্তর হইতে জলদস্যুদের উৎপাতে, দক্ষিণ হইতে আরবদের আক্রমণের ভয়ে, পূর্ব হইতে অসভ্যদের চাপে, এবং আভ্যন্তরীণ বিকাশের পূর্ণ ফল হিসাবে, পশ্চিম ইওরোপবাসীদের রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থাকে সংহত ও সুদৃঢ় করিয়া লইতে হইল। ফিউডাল সমাজের পুরাপুরি রূপ এইবার প্রকাশ পাইল, দশ হইতে চৌদ্দ শতক পর্যন্ত পশ্চিমের আসল ফিউডাল সামন্ত যুগ।

ফিউডাল ইওরোপের প্রধান দুই শ্রেণী—জমিদার সামন্তেরা এবং সাধারণ সার্ফ কৃষকগণ। এই সার্ফেরা ঠিক দাস নহে, আইনত তাহারা প্রভুদের সম্পত্তি ছিল না। তাহাদের নিজস্ব কিছু কিছু জমি থাকিত, সেই জমি চাষে সংসার-যাত্রা চলিত; কিন্তু ইচ্ছানুসারে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার স্বাধীনতা না থাকাতে তাহাদের ভূমিদাস বলা যায়। সার্ফদের প্রায় অর্ধেক সময় প্রভুর জমিতে হাজিরী দিতে হইত বেগার খাটিবার জন্য। তাহারা মালিকের খাস জমি বিনা-মজুরিতে চাষ করিয়া দিত, অন্য কাজ করিত, ফরমাশ খাটিত। নিজেদের জমিতে উৎপন্ন শস্যেরও কিছু ভাগ দিয়া তাহারা প্রভুর অন্য দাবি মিটাইত। ইহা ছাড়া অবশ্য রাজাকে দেয় কর জোগানো এবং পুরোহিতদের প্রাপ্য চুকাইবার ভারের কথাও মনে রাখিতে হইবে। আর্থিক শোষণ ছাড়া অন্য দাবিরও অন্ত ছিল না। জমিদারের কাছারিতে প্রজাদের বিচার চলিত; নূতন প্রজাকে জমি হাতে লইবার আগে নজর দিতে হইত; জঙ্গলে শিকার করা কিংবা কাঠ কুড়ানো অথবা নদীতে বা পুকুরে মাছ ধরিবার স্বাধীনতা চাষীদের ভাগ্যে অনেক সময় জুটিত না; জমিদারের রাস্তা বা সাঁকোয় চড়িলে কর দেওয়ার নিয়ম ছিল; গম ভাঙিতে হইত জমিদারের জাঁতাকলে পয়সা

দিয়া ; সময়-অসময়ে ভেট দিবার রীতিও ছিল প্রচলিত। প্রজাদের শাসন-ব্যাপারে রাজার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল কম, সামন্তেরাই চাষীদের আসল শাসক ছিল। দাস না হইলেও সার্ফদের শোষণের কোনো অভাব দেখা যায় না। সেই শোষণের প্রধান কথা হইল নিয়মিত-ভাবে দিনের পর দিন বেগার খাটাইয়া জমিদারের জমি চাষ করাইয়া লওয়া।

খাস জমিতে বেগার খাটানোর প্রথা যে ফিউডাল যুগে সর্বত্র সব সময় চালু ছিল, কিম্বা বেগার খাটানো বন্ধ হইলেই ফিউডাল শোষণ শেষ হইয়া যায়, এমন কথা অবশ্য বলা চলে না। কোথাও কোথাও কোনো কোনো সময়ে ছোটো চাষীদের নিজ মাঠে উৎপন্ন শস্যের অনেকখানি অংশ আইন-কানুনের চাপে বিনা মূল্যে জমিদারের হাতে তুলিয়া দেওয়ার রেওয়াজটাও ফিউডাল শোষণ পদ্ধতির অঙ্গ। উন্নততর অবস্থার চাষীরা জমিদারের প্রাপ্য টাকায় চুকাইয়া দিতেছে এমন ব্যবস্থাও দেখিতে পাওয়া যায়। ফিউডাল সমাজের আসল আর্থিক বিশেষত্ব হইল এই যে, উৎপাদনের প্রায় গোটা ক্ষেত্র জুড়িয়া আছে কৃষিকার্য ; অগণিত টুকরা টুকরা জমিতে অসংখ্য ছোটো চাষী অক্লান্ত পরিশ্রমে নিতান্ত অনগ্রসর প্রথায় চাষ করিয়া কোনোক্রমে নিজেদের ভরণপোষণ করিতেছে ; উৎপন্ন জিনিসের একটা বিপুল অংশ জমি-দারের হাতে তুলিয়া দিতে তাহারা আইনত বাধ্য—হয় খাস জমিতে বেগার খাটিয়া, নয়তো নিজ মাঠের উৎপন্ন শস্যের ভাগ ছাড়িয়া দিয়া, কিংবা সমমূল্যের টাকা খাজনা জোগান দিয়া।

ফিউডাল যুগে অধিকাংশ লোক গ্রামে থাকিত, এই গ্রামগুলিকে তখন ম্যানর নাম দেওয়া হয়। প্রতি ম্যানরের কোনো প্রভু বা জমিদার ছিল; গ্রামের জমির খানিকটা থাকিত তাহার খাসদখলে, বাকিটা প্রজাদের হাতে। চাষীরা খাটিত কখনো নিজের জমিতে, কখনো জমিদারের এলাকার মধ্যে। সাধারণ লোকের বিচার করিবার ও শাস্তি দিবার ক্ষমতা প্রভুর ছিল, অপরাধের জন্য কাছারিতে জরি-মানা আদায় ছিল জমিদারের একটা বড়ো লাভের উপায়। মধ্যযুগে চাষের ধরন ছিল অনুন্নত ; একজনের জমির সঙ্গে অন্যের সীমানা স্পষ্ট থাকিত না, লাঙল ও সার দিবার প্রথা ছিল বাজে রকমের, সকলে একই শস্যের চাষ না করিলে চলিত না, ফসলের পরিমাণ ছিল সামান্য। তবে চাষীদের কিছু কিছু সুবিধাও ছিল। ফসল কাটার

পর সকলের জমিতে সকলে গোরু চরাইতে পারিত, আর গ্রামের সাধারণ গোচারণের মাঠে ছিল সকলেরই অধিকার, আবার জমিদারেরা বাহিরের বিপদ হইতে প্রজাদের রক্ষা করিত।

ফিউডাল রাষ্ট্র জমিদারের সৃষ্টি, রাষ্ট্র তাহাদেরই হাতের মুঠোয় ছিল। তখনকার রাজাকে জমিদারের মধ্যে প্রধান বলা চলে। ছোটো জমিদারের উপর বড়ো জমিদার, তাহার উপর আরো বড়ো, আর সবার উপরে রাজা— এইভাবে সামন্তদের মধ্যে স্তরভেদ এ-যুগের আর-একটি বিশেষত্ব। চাষীরা জমি পাইত গ্রামের জমিদারের কাছ হইতে, সেই জমিদারের প্রভু আবার বড়ো সামন্তেরা, সামন্তেরা জমি পাইত রাজার কাছ হইতে। রাজকার্য চলিত সামন্তের সাহায্যে; যুদ্ধের সময় তাহারাই রাজাকে সৈন্য জোগাইত; রাজার প্রাপ্য আদায় করিয়া দিত সামন্তেরা। নামে দেশের অধীশ্বর হইলেও তাই ফিউডাল রাজাদের শক্তি ছিল সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রের এই প্রকৃতি ফিউডাল ব্যবস্থার অন্য এক বৈশিষ্ট্য। ইহার ফলে রাজা-প্রজায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকিত খুব কম, সামন্তেরা নিজ নিজ এলাকার ছোটো ছোটো রাজা হইয়া বসিয়াছিল।

ফিউডাল যুগে পাদ্রিদের ও তাহাদের প্রতিষ্ঠান ক্যাথলিক চার্চের প্রতাপ প্রায় অসীম হইয়া ওঠে। চার্চের গড়নে আমরা ফিউডাল ধারণার প্রভাব দেখতে পাই। পোপের স্থান হইল চার্চের মাথায়— তাহার নীচে সামন্তদের মতন বিশপেরা কর্তৃত্ব করিতে থাকে, বিশপের নীচে সাধারণ পাদ্রিরা। ইওরোপে চার্চই ছিল সব চাইতে বড়ো জমিদার, দেশের অনেক জমিই বিশপ ও মঠগুলির হাতে থাকিত। ফিউডাল প্রথায় পাদ্রিরাই সেই-সব জমির চাষীদের শোষণ করিত। তাহা ছাড়া সকলের কাছ হইতে ধর্মের নামে চার্চ অতিরিক্ত অনেক কিছু আদায় করিতে থাকে। চার্চের আলাদা বিচারালয়গুলির লোকের উপর নানা বিষয়ে কর্তৃত্ব করিবার অধিকার ছিল।

সাধারণ লোকের দিক হইতে দেখিলে পুরোহিত ও সামন্তশ্রেণী দুই-ই তখন ছিল শোষক। কিন্তু দুই শ্রেণীর মধ্যে নিজেদের অধিকারের সীমানা লইয়া মধ্য যুগে এক প্রচণ্ড ঝগড়া চলে; চার্চ ও রাষ্ট্রশক্তির এই দ্বন্দ্ব সে-যুগের ইতিহাসের অনেকখানি জুড়িয়া আছে। বিভিন্ন দেশের ফিউডাল রাজাদের মাথার উপরে এক সম্রাটের পদ সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথম শার্লেমেন প্রভৃতি ফ্রাঙ্কদের রাজারা, পরে

অটো ইত্যাদি জার্মান রাজারা সম্রাট হইয়াছিলেন। মধ্যযুগের সাম্রাজ্যকে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে দেখা হইত, এই সম্রাটদেরও বলা হইত রোমান সম্রাট। পোপদের সঙ্গে সম্রাটদের বার বার সংঘর্ষ হয়। কিন্তু সাধারণ লোককে শোষণ বা দমন করিবার সময় ইহাদের মধ্যে অমিল দেখা যায় না, পুরোহিত ও সামন্তেরা তখন অভিন্ন।

মধ্যযুগের সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠে ক্যাথলিক চার্চের ছায়ায়। শিক্ষিত লোকেরা তখন প্রায় সকলেই পুরোহিত, লেখাপড়ার ভারও তাহাদের হাতে। খৃস্টান ধর্মতত্ত্ব তাই প্রধান বিস্তার স্থান পায়; গ্রীক ও রোমানদের বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদির কথা লোকেরা ভুলিয়া গেল। দেবভাষা লাটিন হইল শিক্ষার বাহন, পণ্ডিতেরা তাহাতেই লিখিতেন, সাধারণের ভাষাকে গ্রাম্য বলিয়া অবজ্ঞা করা হইত, বিদ্যা-চর্চায় সাধারণ লোকের পুরোহিত না হইলে অধিকার থাকিত না। মধ্যযুগে অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিতের জন্ম হয়, কিন্তু তাঁহারা জীবন কাটাইলেন নিষ্ফল তর্কে আর ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায়; বিশ্বসংসারের আসল প্রকৃতি বুঝিতে তাঁহাদের কোনো আগ্রহ দেখা গেল না, শোষক চার্চের মহিমা বাড়াইতে তাঁহাদের সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধির নিয়োগ দেখা যায়। শিল্পকলার মধ্যে মন্দির নির্মাণ ও মূর্তি গড়া উল্লেখযোগ্য, সেখানেও চার্চের গৌরববৃদ্ধি ছিল মূল লক্ষ্য। সামন্তশ্রেণীর মধ্যে যেটুকু সংস্কৃতির চিহ্ন দেখা যায় সেখানেও চোখে পড়ে আভিজাত্য ও সাধারণ মানুষের আদর্শের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য। যোদ্ধা নাইটদের ধ্যানধারণার মধ্যে সাধারণের প্রবেশ নাই। চাষীদের জীবন ছাইয়া রহিল কুসংস্কার; প্রভুত্ব ও অর্থের লোভে পুরোহিতেরা তাহার প্রশ্রয় দিয়া থাকিত।

এগারো শতক পর্যন্ত মধ্যযুগে বড়োলোকদের প্রাসাদ ও দুর্গ এবং চাষীদের গ্রাম্য জীবন ছাড়া কিছু প্রায় চোখে পড়ে না। গ্রামগুলিও ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, এক গ্রামের সঙ্গে গ্রামান্তরের আর্থিক যোগ তখন সামান্য। তাহার পর কিন্তু শহরের প্রভাব বাড়িতে থাকে। শহরের শ্রীবৃদ্ধির মূলে ছিল কারিগরদের কাজের বিস্তার। চাষের কাজের পাশে ক্রমে ক্রমে হাতের কাজের একটা বিশেষ স্থান ফিউডাল সমাজে গড়িয়া ওঠে। কারিগর ও ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। শহরে প্রস্তুত নানা জিনিস আশেপাশের গ্রামবাসীরা কিনিতে আরম্ভ করে। তাহার বদলে শহরবাসীরা কিনিত গ্রামে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য।

ছোটো ছোটো বাজার দেখা দিতে লাগিল, সেখানে চলিত ছোটো ছোটো এলাকার মধ্যে কেনাবেচা। মাঝে মাঝে বড়ো মেলাও দেখা যায়, সেখানে দূরের লোকেরা আসিয়া জুটিত। ধীরে ধীরে বিনিময়ের প্রথা এইভাবে বাড়িতে থাকে, শ্রমবিভাগ এবং শহরের কারিগরদের পরিশ্রম হইতে ইহার আরম্ভ।

কারিগরের কাজ ও কেনাবেচার বিস্তার কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত ফিউডাল সমাজের আওতার মধ্যেই থাকে। বিশপ ও ব্যারন, পুরোহিত ও সামন্ত শুধু নিজ নিজ এলাকার মধ্যে চাষীদের শোষণ করিয়া ছাড়ে নাই, নিকটের শহরের বণিকদের লাভ ও কারিগরদের পরিশ্রমে ভাগ বসাইতেও তাহাদের উৎসাহের অভাব ছিল না। জমিদারদের হাত এড়াইবার জন্য শহরের লোকেরা স্বায়ত্ত-শাসনের চেষ্টা করিতে লাগিল, যেখানে সে-চেষ্টা সফল হয় সেখানে স্বাধীন শহর বা কমিউন দেখা গেল। অনেক সময় রাজারা ইহাদের সহায় হয়, তখন রক্ষক রাজাই হইল নূতন শোষক।

ফিউডাল যুগে সামাজিক জীবনে সংঘবদ্ধ হওয়া রীতি ছিল, প্রতি ম্যানর বা গ্রামে আমরা তাহার পরিচয় পাই। শহরেও সেই প্রথা ছড়াইয়া পড়ে, তাই বণিক ও কারিগরদের গোষ্ঠী বা গিল্‌ড্‌ সর্বত্র স্থাপিত হইল। এক-এক গিল্‌ডে এক-এক ব্যবসার লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করে, গিল্‌ড্‌গুলি প্রভুশ্রেণীর শোষণ আটকাইবার খানিকটা উপায় ছিল। গিল্‌ডের আর-এক উদ্দেশ্য গিল্‌ডের লোকদের যাহাতে ক্ষতি না হয় প্রতিযোগিতা কমাইয়া তাহার ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক ব্যবসায়ে তাই কতকগুলি নিয়ম জারি করা হইত— যেগুলি প্রত্যেককে মানিয়া চলিতে হইত। গিল্‌ডের লোকেরা বিপদে-আপদে পরস্পরের সহায় হইত, প্রত্যেক গিল্‌ডের একটা আলাদা সামাজিক জীবন গড়িয়া ওঠে। প্রত্যেক শহরে তাঁতি, ছুতোর, মুচি, কামার, মিস্ত্রী প্রভৃতির আলাদা আলাদা গিল্‌ড্‌ সে-যুগের বিশেষত্ব। ক্রমে গিল্‌ডের মধ্যেও শোষণ দেখা গেল। গিল্‌ড্‌ চালাইত ওস্তাদ কারিগরেরা, তাহাদের প্রত্যেকের দুই-চারিজন সহকারী থাকিত; আসল খাটুনি পড়িল এই লোকগুলির উপর, তাহাদের পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করিতে থাকে ওস্তাদেরা। শহরের এই শ্রেণীভেদের মতন একটা পার্থক্য পরে গ্রামেও দেখা দেয়, যখন অবস্থাপন্ন কৃষকদের কাছে সামান্য চাষীরা ক্ষেতমজুরের কাজ করিতে বাধ্য হইল।

মধ্যযুগের শেষের দিকে স্থানীয় কেনাবেচা ছাড়া দেশবিদেশের মধ্যে বাণিজ্যেরও সূত্রপাত হইল। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধগুলির ফলে বাণিজ্য প্রথম ছড়াইয়া পড়ে। খৃস্টানদের তীর্থভূমি প্যালেস্টাইন মুসলমানদের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু প্রথম হইতেই ধর্মের চাইতে লুটপাটের দিকে বেশি নজর পড়ে। ক্রুসেডের টাকা, রসদ, জাহাজ ইত্যাদি জোগাইত বণিকেরা; নিজেদের লাভের সুবন্দোবস্ত করিতেও তাহারা নিশ্চয় ছাড়ে নাই। পূর্বদেশের সঙ্গে ইটালীয় বণিকেরা এইবার বাণিজ্য আরম্ভ করে। বড়োলোকদের বিলাসের নূতন নূতন উপকরণ তাহারা আনিয়া দিতে লাগিল— রেশমী কাপড়, মণিমাণিক্য, রান্নার মশলা ইত্যাদি এখন পূর্ব অঞ্চল হইতে ইওরোপে আসিতে থাকে।

ফিউডাল ইওরোপের কথা শেষ করিবার আগে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব ইওরোপের এই যুগের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। প্রথম অঞ্চলটিতে এই সময় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের দিন, সেখানে রোমান সমাজের দাসত্ব ও এশিয়ার প্রাচীন সমাজপ্রথা চলিতে থাকে; ব্যবসা-বাণিজ্যের সেখানে আদি ফিউডাল যুগের পশ্চিম ইওরোপের মতন দুরবস্থা হয় নাই। পশ্চিমী ফিউডাল প্রথা ক্রুসেডের পর এই অঞ্চলেও অনেকখানি ছড়াইয়া পড়ে। তাহার আগেই অবশ্য ইস্‌লাম ও আরব সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে বাইজান্টাইন রাজত্বের সৌভাগ্যের শেষ হইয়া যায়।

আরবের পশুপালক সমাজ পরিবর্তিত হইতেছিল, সেখানে শ্রেণীভেদ মরুভূমির মধ্যেও জাগিয়া উঠিতেছিল, সমাজকে বাঁধিবার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইল। নূতন ধর্মের উত্তেজনাকে আশ্রয় করিয়া আরব রাষ্ট্রের জন্ম হয়, দিগ্‌বিজয়ের ফলে সেই রাষ্ট্র এক বিশাল সাম্রাজ্যের আকার লইল যাহার সঙ্গে একমাত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রসারের তুলনা চলে। স্পেন হইতে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ছিল; পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের অনেকখানিই ইহার অন্তর্গত হইয়া পড়িল। আরবেরা বাণিজ্যে নিপুণ ছিল— পরে ইটালীয় বণিকদের সঙ্গে তাহাদের যোগস্থাপন হয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাহারা অসামান্য ছিল— গ্রীক ও ভারতীয়দের অনেক বিদ্যা তাহাদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকে ও পরিবর্ধিত হয়। আরব ও পরবর্তী ইস্‌লামীয় সাম্রাজ্য-গুলির আর্থিক বনিয়াদ সেই প্রাচীন এশিয়াটিক প্রথারই নূতন

সংস্করণ। ইস্‌লাম ধর্মজগতে মানুষের শ্রেণীভেদ ও শোষণপ্রথার বাস্তবিক কোনো অন্যথা দেখা যায় না। ভারতবর্ষে যখন ইস্‌লাম রাজ্যজয় করে, তখনো দেখি প্রাচীন সমাজের আর্থিক গড়নের মূলে কোনো পরিবর্তন আসে নাই।

পূর্ব ইওরোপে দশম শতক পর্যন্ত অসভ্য সমাজের শেষ দশাই চোখে পড়ে। শ্লাভ ও ফিন জাতীয় লোকেরা এ-অঞ্চলে বসবাস করিত। তাহারা রোমানদের কবলে পড়ে নাই, বহুকাল পর্যন্ত আদিম যুগের শ্রেণীহীন অবস্থা এখানে টিকিয়া থাকে। ক্রমে এখানেও শ্রেণীভেদ, শোষণ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়; বাইজান্‌টিয়াম হইতে খৃস্টধর্ম আসিয়া এখানে প্রবেশ করে। অসংখ্য ছোটো ছোটো রাজ্য এদিকে তখন দেখা গেল; এগারো ও বারো শতকে কিয়েভ তাহাদের মধ্যে প্রধান। এই রাজ্যগুলির আর্থিক গড়ন এশিয়ার প্রাচীন সভ্য-সমাজের অনুরূপ।

তেরো শতকে চীনের প্রান্ত হইতে পূর্ব ইওরোপ পর্যন্ত মোঙ্গোল-তাতার জাতির বিশাল সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়— জেঙ্গিস্ খান-এর দিগ্‌বিজয় ইহাকে গড়িয়া তোলে, আরবদের দেশজয়ের সঙ্গে তাহার তুলনা করা যায়। রুশ দেশের ছোটো রাজারা তাতারদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল প্রায় আড়াই শত বৎসর ধরিয়া। পূর্ব ইওরোপের রাজারা ও সামন্ত শ্রেণী প্রজাদের শোষণ করিয়া তাতার সম্রাটের রাজস্ব ও কর জোগাইত। পনেরো শতাব্দীর শেষে মস্কোর রাজারা স্বাধীন হইয়া নিজেদের সাম্রাজ্য গড়ে—তাহাদের সম্রাট বা জার উপাধি এই নূতন গৌরবের পরিচয়।

এদিকে ধীরে ধীরে প্রাচীন সামন্ত প্রথা এখানে পশ্চিমী ফিউডাল ব্যবস্থায় পরিণত হইল। রুশ দেশে সামন্ত শ্রেণীর নাম বয়ার; প্রজারা ক্রমশ এই বয়ারদের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়ে। চাষীদের বেগার খাটাইয়া বয়ারদের জমি চাষ আরম্ভ হইল— ফিউডাল সমাজের প্রধান আর্থিক বিশেষত্ব এইখানে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে সার্ফ প্রজার পাকা বন্দোবস্ত হইল, চাষীদের গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়া বারণ হইয়া গেল। ইহার পরও প্রায় তিনশত বৎসর রুশদেশে ফিউডাল সমাজ কর্তৃত্ব করে। কিন্তু ততদিনে পশ্চিম ইওরোপে আসিল বিস্তর পরিবর্তন।

উপরে বর্ণিত ফিউডাল ব্যবস্থা অবশ্যই অনেকাংশে সরল

সামান্যীকৃত রূপরেখা। বাস্তব অনুসন্ধানে ইহার মধ্যে অনেক রকমফের দেখা যাইবে। দেশে দেশে, পর্বে পর্বে, অঞ্চলে-অঞ্চলে অনেক পার্থক্য গবেষকদের চোখে পড়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। কিন্তু ব্যাপক দৃষ্টিতে একটা সামগ্রিক ছবি খাড়া করা ভিন্ন ইতিহাসের প্রথম পাঠে অন্য উপায় নাই। প্রত্যেক সমাজে প্রাথমিক আলোচনায় আমাদের তাই সরলীকরণ অপরিহার্য। বিস্তৃত বিশ্লেষণে ছকের যে অনেক জটিলতা চোখে পড়ে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু তাহা হইলে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের কাজ, সাধারণ পাঠকের নয়। শুধু ফিউডাল নয়, আমাদের আলোচ্য সব কয়টি সামাজিক টাইপ সম্বন্ধে এই কথাগুলি প্রযোজ্য।

মধ্যযুগের রূপান্তর

আসল ফিউডাল সমাজের চেহারায় বড়ো পরিবর্তন আরম্ভ হইবার পর হইতে ক্যাপিটালিস্ট ধনিকতন্ত্র গড়িয়া ওঠা পর্যন্ত সময়টুকু আয়তনে নিতান্ত কম নয়। মোটামুটি তারিখের হিসাব করিলে ইহার ব্যাপ্তি চৌদ্দ হইতে সতেরো শতক। (প্রসঙ্গত মনে রাখা উচিত যে ইতিহাসে এক সমাজ হইতে অন্য সমাজে উত্তরণের পর্বগুলি অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী হইয়া পড়ে।) অসংখ্য স্মরণীয় ঘটনায় এই সময়ের ইতিহাস পরিপূর্ণ। পশ্চিম ইওরোপের যে-রূপান্তর এখন ঘটিতে থাকে তাহার অনেকগুলি দিক আছে।

প্রথমত, ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করেন যে, এই সময়ের মধ্যে মধ্যযুগ শেষ হইয়া গিয়া ইওরোপীয় ইতিহাসে আধুনিক যুগ আসিল। এই সময়ের রাষ্ট্রিক পরিবর্তনগুলি ইতিহাসের সাধারণ ছাত্রদের পর্যন্ত বিশেষ করিয়া পড়িতে হয়। সম্রাট ও পোপদের ইওরোপ-জোড়া কর্তৃত্বের এবার অবসান হইল; বিভিন্ন দেশের রাজারা এখন নিজ নিজ এলাকার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইয়া বসে। দেশের মধ্যে ফিউডাল সামন্তদের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা খর্ব করিয়া অবাধ রাজশক্তির আবির্ভাব হয়, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি নামে ইতিহাসে ইহার পরিচয়। রাষ্ট্রনীতিতে এখন হইতে সমস্ত ইওরোপকে আর এক ও অখণ্ড না ভাবিয়া, বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির পূর্ণ স্বাধীন সত্তা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। মেকিয়াভেলি ও গ্রোটিয়াসের নির্দেশে আন্তর্জাতিক আচার-ব্যবহারে আধুনিক রীতিনীতিকে মানিয়া খৃস্টান ধর্মনীতির প্রভাবকে অস্বীকার করা হইল।

দ্বিতীয়ত, ইওরোপীয় সংস্কৃতির রূপান্তর আরো উল্লেখযোগ্য হিউম্যানিস্ট্ পণ্ডিতদের আন্দোলনে পুরাতন লুপ্তপ্রায় গ্রীক ও রোমক সাহিত্য, দর্শন, শিল্প প্রভৃতির পুনরুদ্ধার হয়; এই নূতন জাগরণের নাম রেনেসাঁস। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সনাতনী বিধি-বিধানকে অমান্য করিবার মতন চিন্তার সাহসও দেখা দিতে আরম্ভ করে। ক্যাথলিক ধর্মমতের বিপুল সংস্কার করিয়া উত্তর ও পশ্চিম ইওরোপে প্রটেস্টান্ট

সম্প্রদায়গুলির অভ্যুদয় হইল; ইহার নাম রিফর্মেশন, ইহার ফলে সমাজে আসিল পুরোহিত শ্রেণীর আধিপত্যের অবসান। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হইল এই যুগে, মানুষ জড়জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম-গুলি বুঝিতে শিখিয়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্বের সূত্রপাত করিল। বিভিন্ন দেশে স্বদেশী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও জাতীয় সাহিত্যের জন্মও এই যুগের কথা।

তৃতীয় বিশেষত্ব দেখি ইওরোপীয় বাণিজ্যের বিশাল বিস্তারে। নূতন নূতন জলপথের সন্ধান পাইয়া সমুদ্রপারের অজানা দেশের আবিষ্কার হইতে লাগিল বণিকদের উদ্যোগে। তাহার ফলে প্রথম জগৎজোড়া বাণিজ্যের সম্ভাবনা দেখা দেয়। অনুন্নত দেশে উপনিবেশ স্থাপন ও সাম্রাজ্যের বিস্তার হইতে লাগিল; ইওরোপীয় বণিকেরা সেখানে লুটপাট ও অন্যবিধ শোষণের ব্যবস্থা করিতে থাকে; আফ্রিকা হইতে নিগ্রোদের ধরিয়া আনিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করা হইল। উপনিবেশ ও বাজারের অধিকার লইয়া শোষক জাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহও আরম্ভ হয়।

চতুর্থ পরিবর্তন, ইওরোপে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালীর মধ্যে। ফিউডাল সমাজের কারুশিল্প (handicraft) বদলাইয়া হাতের কাজের নূতন ধরন, সমবেত হস্তোৎপাদন (manufacture) ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। কাজের মধ্যে শ্রমভেদ ইহার মূলে রহিয়াছে। একটা গোটা জিনিস এক ধরনের কারিগরে প্রস্তুত না করিয়া তাহার বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন লোকেরা তৈয়ার করিতে লাগিল। ছোটো কারখানারও আরম্ভ দেখি, যদিও কাজ এখনো হাতিয়ারের সাহায্যেই চলিতে থাকে—আধুনিক কালের যন্ত্রপাতি আরো পরে আসে। বিভিন্ন কারিগরের কাজ একত্র করা, তাহাদের মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া, উপাদান জোগাড় ইত্যাদির ভার পড়ে ব্যবসায়ী বণিকদের উপর; কারিগরের প্রস্তুত জিনিস বিক্রয় এখন বণিকদের হাতে। ক্রেতার সঙ্গে কারিগরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ফিউডাল যুগের ব্যবস্থা ছিল, এখন তাহার শেষ হইতেছে। অর্থনীতিতে এই নূতন ব্যবস্থাকে অনেক সময় গৃহজাত শিল্প (domestic) নাম দেওয়া হয়, পরের যুগের মিল বা ফ্যাক্টরির সঙ্গে তফাৎ নির্দেশ করিবার জন্য; হস্তশিল্পীরা তখনো প্রধানত নিজেদের গৃহে বসিয়া কাজ করিতে পারিত। তৃতীয় ও চতুর্থ বিশেষত্ব দুইটিকে একত্র করিয়া

এই সময়ের নাম দেওয়া হইয়াছে মার্কেণ্টাইল অথবা বণিকযুগ; ইহাকে ক্যাপিটালিস্ট বা ধনিক যুগের আদিকাল হিসাবে ধরা যায়।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্যকে মার্কস প্রাথমিক পুঁজি-সংগ্রহ নাম দিয়াছিলেন। বিস্তারিতভাবে ধনতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে ইহার দরকার ছিল; নানা-ভাবে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। দেশের মধ্যে অনেক অঞ্চলেই ছোটো ছোটো চাষার উচ্ছেদ করিয়া জমি জড়ো হইতে লাগিল জমিদার ও অবস্থাপন্ন কৃষকদের হাতে। এই জমিতে ভেড়ার পাল চরাইয়া প্রচুর লাভের উপায় হয়। অন্যত্র কৃত্রিম সার ফেলিয়া, নূতনভাবে চাষ করিয়া বেশি শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। বণিকদের পুঁজি বাড়িতে থাকে নূতন নূতন বাজারে পণ্য বিক্রয় ও দুর্বল দেশ লুটপাটের মধ্যে। একদিকে জমি ও টাকার সঞ্চয়; অন্যদিকে দেখি বেকার নিঃস্ব লোকের ক্রমশ সংখ্যাবৃদ্ধি। ধীরে ধীরে তাহাদের আর মজুরি ভিন্ন জীবিকানির্বাহের অন্য উপায় থাকিল না। উৎপাদনের অবলম্বনগুলি তাহাদের হাতছাড়া হওয়াতে, ইহাদের মালিকের অধীনে মজুরি করা ভিন্ন গতি রহিল না। পরবর্তী যুগের প্রোলে টারিয়েট বা নিঃস্ব শ্রেণীর উৎপত্তি এইখানে।

এই অধ্যায়ে আলোচ্য সময়ের শেষ বৈশিষ্ট্য, পণ্য উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থার প্রসার। নিজের ভোগের বদলে বাজারে বিক্রয়ের জন্য উৎপন্ন জিনিসের আর্থিক নাম পণ্য। ধনতন্ত্রের জগতে সমস্ত মালেরই পণ্যে পরিণত হওয়ার ঝোঁক থাকে, কিন্তু পূর্ণ ধনতন্ত্র ছাড়া অন্য সময়েও কিছু পরিমাণ পণ্য-বিনিময় চলিতে পারে। মধ্যযুগের রূপান্তরের সময় ইহার নিদর্শন সহজেই চোখে পড়ে। আসল ধন-তন্ত্রের আওতার বাহিরে পণ্য-বিনিময়কে মার্কস অপরিণত বা সামান্য বিনিময় ব্যবস্থা (simple commodity economy) নাম দিয়া-ছিলেন। ইহাকে অবশ্য স্বতন্ত্র সমাজ বলা চলে না, রূপান্তর পর্বের আনুষঙ্গিক অঙ্গ হিসাবেই আমরা ইহাকে দেখিব।

চৌদ্দ শতকে ফিউডাল অবস্থার প্রথম পরিবর্তন আরম্ভ হয় চাষীদের মধ্যে। জমিদারের টাকার দরকার বেশি পরিমাণে হইতে থাকিল; পূর্বদেশ হইতে বণিকেরা ক্রুসেডের পর যে-সব বিলাসের উপকরণ আনিতে লাগিল তাহা ভোগ করিবার জন্য টাকা লাগিত; বেগার খাটাইয়া খাস জমি চাষ করার চাইতে প্রজাদের কাছ হইতে নগদ টাকা আদায় এখন বেশি লাভের উপায় মনে হয়। তাই ফিউ-

ডাল ব্যবস্থার প্রধান বিশেষত্ব, চাষীদের দিয়া সাক্ষাৎ জমি চাষ করার রীতি অনেক জায়গায় উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করে। অবশ্য ইহাতে শোষণের কিছুমাত্র লাঘব হইল না। চাষীরা নামে মুক্তিলাভ করিতে থাকে, কাজে শস্য বিক্রয় করিয়া টাকা অথবা উৎপন্ন শস্যের অনেক-খানি দিয়া জমিদারের দাবি মিটাইতে হইত। উৎপীড়িত চাষীদের বিদ্রোহ এই সময়ের ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া আছে। ব্ল্যাক ডেথ নামক মহামারীতে অসংখ্য চাষীর মৃত্যু হওয়াতে বাকিদের উপর চাপ অনেক বাড়ে। ফ্রান্সে ১৩৫৮ সালে প্রজাদের 'জাকেরি' বিদ্রোহ আরম্ভ হয়; ১৩৮১ সালে ইংল্যাণ্ডে ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে চাষী-বিদ্রোহও উল্লেখযোগ্য। জার্মানিতে পনেরো শতকের শেষ হইতে ক্রমাগত চাষীদের বিদ্রোহ হইতে থাকে। ঘোর শীতের মধ্যেও চাষীদের আস্ত জুতা পরিবার সংস্থান ছিল না; জার্মান প্রজা-বিদ্রোহের নিশান হিসাবে তাই ছেঁড়া জুতার ছবির ব্যবহার দেখিতে পাই।

শহরেও শ্রেণীসংগ্রাম এখন তীব্র আকারে প্রকাশ পাইল। এখানে প্রধান অত্যাচারী বণিক ও ওস্তাদ কারিগরেরা; সাধারণ কারিগরদের উপর তাহাদের শোষণ চলিল অবাধে। ইটালির শহর-গুলিতে মহাজনের আবির্ভাব আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার; প্রথম ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা এই সময়ে। টাকার জোরে তাহারা শহরের মালিক হইয়া দাঁড়াইল। ফ্লরেন্স নগরীতে মহাজন মেডিচিরাই হইল শাসক; জার্মানিতে মহাজন ফুগার বংশ খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে। বেল্জিয়ামের ফ্লাণ্ডার্স প্রদেশে চৌদ্দ শতকে কারিগরদের সঙ্গে মালিকদের প্রকাশ্য যুদ্ধ অনেক বার হয়। ফ্লরেন্সে ১৩৭৮ সালের চিয়ম্পি বিদ্রোহেও সাধারণ কারিগরদের সংগ্রাম দেখা গেল। অন্তর্বিরোধে ফিউডাল গিল্ডগুলি ভাঙিয়া পড়িতে থাকে এই সময় হইতে। গ্রামের মতন শহরেও পুরাতন আমল শেষ হইতে থাকিল।

ইটালির শহরগুলিতেই নূতন বুর্জোয়া সংস্কৃতির উদয় হয়—এখানেই প্রথম রেনেসাঁসের আরম্ভ, বণিকেরাই ছিল হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতদের প্রধান সহায়। মধ্যযুগের স্থিতিশীল সংস্কৃতি, ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মনীতি লইয়া বিভোর হইয়া থাকা আর ইহাদের তৃপ্তি দিতে পারিল না। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের বিদ্যাগুলির আবার চর্চা হইতে লাগিল, তাহাই এখন নূতন যুগের বেশি উপযোগী মনে হয়। পেট্রার্ক

ও বোকাশিও ইটালিতে রেনেসাঁসের প্রচলন করিলেন ; লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মধ্যে শিল্প ও বিজ্ঞানের অপূর্ব সমাবেশ দেখা গেল, হিউম্যানিস্টদের মধ্যে তাঁহার প্রতিভাই সব চাইতে উল্লেখযোগ্য। সেকালের হারানো পুঁথি খুঁজিয়া বাহির করা হইতে লাগিল ; প্রাচীন বইগুলি লোকে সযত্নে পড়িতে থাকে ; ক্রমে নিজেদের ভাষায় আপনাকে প্রকাশ করিবার এবং চারুশিল্পের নূতন বিকাশের পথে উৎসাহ দেখা দিল। রেনেসাঁসের ফলে আমরা ইংল্যাণ্ডে পাই শেক্‌স্‌পীয়ারের যুগের মহান সাহিত্য, তাহার কিছু পরে ফ্রান্সের সাহিত্য সম্পদ। অবশ্য রেনেসাঁস ইটালিতে আরম্ভ হয় অনেক আগে, চৌদ্দ শতকের শেষের দিকে ; নবজাগরণের ঢেউ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে পোঁছিতে দেরি হয়। রেনেসাঁস-শিল্পীগণ নানা দেশে কীর্তি রাখিয়া গেলেন ; ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া ও গৃহ নির্মাণে তাহার চিহ্নগুলি আজ পর্যন্ত আদর পাইতেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, এই হিউম্যানিস্ট সংস্কৃতির সঙ্গে বণিক বুর্জোয়া শ্রেণীর যোগ নিবিড়। এই বুর্জোয়া শ্রেণী ঠিক আজকালকার কলওয়ালা ধনিক নয়। তাহাদের পূর্বগামী বণিক, মহাজন, ওস্তাদ কারিগর প্রভৃতি লোক লইয়া বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের প্রথম আবির্ভাব হয়। হিউম্যানিস্টদের নূতন বিশ্বদৃষ্টিতে নবীন বুর্জোয়াদের স্বাভাবিক মনোভাব প্রকাশ পাইল। স্বর্গরাজ্য ও ধর্মতত্ত্ব লইয়া তাহাদের কী হইবে, পার্থিব জীবনেই তো কত কিছু করিবার রহিয়াছে। মধ্যযুগের ব্যারন ও নাইটেরা নিষ্কর্মা ও মূর্খ, পুরোহিতেরা অসৎ ও ধূর্ত—জগতের সেরা লোক হইল স্বাধীনচেতা পরিশ্রমী বুর্জোয়া ব্যবসায়ীরা। আত্মা লইয়া মাথা ঘামাইয়া লাভ কী, জীবনে উন্নতি ও সুবিধার জন্য প্রয়োজন অন্য বিদ্যার—ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, সৌন্দর্যচর্চার জন্য সাহিত্য ও শিল্প। আধ্যাত্মিক কথা ছাড়িয়া মানুষের যোগ্য বিদ্যার অনুশীলনের জন্যই 'হিউম্যানিস্ট' এই নামের প্রচলন। লোকে নূতন ধরনের শিক্ষা চাহিতে লাগিল, অবশ্য সে-শিক্ষা শুধু বড়োলোক বুর্জোয়াদের পক্ষেই সম্ভব আর তাহাদেরই যোগ্য। জীবনে সাফল্য যে মস্ত বড়ো কথা, আত্মবিকাশ যে প্রধান লক্ষ্য—হিউম্যানিস্টদের এই বিশ্বাসের আর্থিক মূল হইল বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্যম, আত্মনির্ভরতা ও নূতন নূতন ক্ষমতা লাভ। এই সময়ে কাগজ প্রস্তুত করিবার ও ছাপিবার পদ্ধতির উদ্ভাবন হওয়াতে বুর্জোয়া সংস্কৃতি পশ্চিম

ইওরোপে জাঁকিয়া বসিল।

মধ্যযুগের সামন্তরা ছিল ছোটো ছোটো রাজার মতন, দেশের রাজা ছিল অনেকটা সেই সামন্তদের মধ্যে প্রধান মাত্র। আর্থিক পরিবর্তনের ফলে ছোটো ছোটো এলাকাগুলি আর স্বতন্ত্রতা রাখিতে পারে নাই, তাহারা পরস্পরের সঙ্গে বাজারের সূত্রে যুক্ত হইয়া পড়িতেছিল। গ্রামে ও শহরে শ্রেণীভেদ তীব্রতর হওয়াতে এখন অধিক শক্তিশালী শাসকের প্রয়োজন হয়, মালিক শ্রেণীগুলি নিজেদের শোষণের অধিকার বজায় রাখিবার জন্যই কেন্দ্রীভূত শাসনের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতে লাগিল। স্বেচ্ছাচারী কতক সামন্তের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা খর্ব করিয়া রাজাদের প্রতাপ এইভাবে গড়িয়া ওঠে; ঐতিহাসিক গ্রীনের ভাষায় এই অবাধ রাজতন্ত্রকে নিউ মনার্কি বলা হয়। ইংল্যাণ্ডে টিউডর ও ফ্রান্সে বুর্বন বংশের রাজশক্তি এই ধরনের। এখানে দেখিতে হইবে যে, রাজা কিছু সকল শ্রেণীর উর্ধ্বে স্থিত নিরপেক্ষ শক্তি নহে; নূতন আর্থিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত ও সফল করাই রাজাদের কাজ; বিরোধীদের দমন করিলেও গ্রামে জমিদার ও অবস্থাপন্ন কৃষকদের, শহরে বণিক মহাজন প্রভৃতির, আর্থিক প্রভুত্ব রাজারা মানিয়া ও রক্ষা করিয়া চলিত; রাজাকে মালিকদের প্রবল পরাক্রান্ত পাহারাওয়ালা বলিলেও ভুল হয় না। এ-যুগের রাজারা রাষ্ট্রশক্তি অনেকখানি বাড়ায়, কিন্তু দেখিতে হইবে যে, সেই বর্ধিত শক্তি কোন্ কাজে, কাহার স্বার্থে লাগিতেছে। সাধারণ লোকের আর্থিক শোষণে বাধা দেওয়া হইতেছে এমন দৃষ্টান্ত রাজাদের ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। তাহারা জমিদারের অত্যাচার, বণিকের পুঁজিবৃদ্ধি প্রভৃতির সহায় হইয়াই কাজ করিতেছে। রাষ্ট্রের অস্ত্রবলবৃদ্ধি ও শাসনযন্ত্রের শৃঙ্খলা বাড়ানো দেশের মধ্যে শান্তিরক্ষার নামে শোষিত সাধারণ লোকের ঘাড়ে শক্ত হইয়া চাপিয়া বসিল; দেশের বাহিরে অন্য দেশ জয়, লুটপাট ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারিত হইল। এই সময় বারুদের ব্যবহারে রাজার ক্ষমতা অনেক বাড়ে, যুদ্ধ-বিগ্রহের ধরনও বদলাইয়া যায়। ইংরাজ ও ফরাসী রাজাদের অনুকরণে প্রাশিয়া ও রাশিয়ার রাজারাও সতেরো শতকে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি গড়ে। সেখানে তখনো ফিউডাল-প্রথার প্রাচীন প্রভাব থাকিয়া গিয়াছিল, তাই রাজাদের শক্তি সেদেশে ফিউডাল শোষণ ব্যবস্থার সহায় হইয়া রহিল।

নিউ মনার্কির কেন্দ্রীভূত রাজশক্তির যুগেই পশ্চিম ইওরোপে প্রথম দেখা দিতে লাগিল জাতীয়তাবোধ ও নেশন-এর ধারণা। মধ্যযুগের চিন্তায় সারা ইওরোপ এক বিরাট অখণ্ড খৃস্টান সমাজরূপে গণ্য হইত। বিভিন্নদেশীয় অভিজাতেরা পরস্পরকে সগোত্র মনে করিত, একই পুরোহিত শ্রেণীর নেতৃত্বে নানা দেশের জনসাধারণ একসূত্রে বাঁধা পড়িয়াছিল। এখন দেশে দেশে স্বদেশী বুর্জোয়া শ্রেণী জাগিয়া উঠিয়া নিজেদের অধিকার স্থাপনের পথে পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মপ্রত্যয় মাথা তুলিতে লাগিল। ফিউডাল বিধিব্যবস্থা বুর্জোয়া আবহাওয়ায় রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ইওরোপে ন্যাশনালিজম-এর বিকাশ আরম্ভ। তাই তাহার প্রথম প্রকাশ পশ্চিম ইওরোপে, যেখানে প্রথম ফিউডাল অবস্থা কাটিয়া যাইতে শুরু হয়। পরে যখন পূর্ব ইওরোপ ও এশিয়ার সামন্ততন্ত্র ভাঙিয়া পড়িতে থাকে, তখন সে-অঞ্চলেও আবার নেশনের মাহাত্ম্য লোকের চোখে ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিতে পাই।

ফিউডাল যুগের একটি বিশেষত্ব—শহরের গিল্ডগুলি; তাহার দিন এখন ফুরাইয়া আসিল। ওস্তাদদের সঙ্গে তাহাদের সহকারী ভৃত্য-স্থানীয় নিম্নশ্রেণীর কারিগরদের সংঘর্ষে গিল্ডের মধ্যে ভাঙন ধরে; ওস্তাদেরা আবার ক্রমে বণিকদের ফরমাশে খাটিতে থাকে—তাই গিল্ডের আর বিশেষ-কিছু প্রভাব টিকিতে পারে নাই। ছোটো বড়ো কারিগরেরা সকলে এখন বণিকদের নির্দেশে কাজ করিতে লাগিল। প্রথমে বণিকেরা শুধু কারিগরদের প্রস্তুত পণ্যদ্রব্য কিনিয়া লইত। বাজার বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বণিকেরা ফরমাশি জিনিস তৈয়ার করিবার আদেশ দিতে লাগিল, তাহারা কারিগরদের কাঁচা মাল জোগাইতে আরম্ভ করে, নির্দিষ্ট হারে কারিগরদের কাজের দাম দিতে থাকে। আজকালকার শ্রমিকদের মজুরি-প্রথার এইখানে আরম্ভ। তখন পর্যন্ত অবশ্য বেশির ভাগ কারিগর বাড়ি বসিয়া কাজ করিত, হাতিয়ারগুলি তাহাদের তখনো নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। পরিবারের সকলেই বণিকদের ফরমাশে খাটিত, হাতের কাজে মেয়ে ও শিশুদের নিয়োগের সূত্রপাত এইভাবে। হাতের কাজের মধ্যে শ্রমবিভাগ বাড়িয়া চলে, কারিগরদের সাধারণত সমস্ত জিনিসটা তৈয়ার না-করিয়া তাহার বিশেষ বিশেষ অংশ প্রস্তুতে লাগিয়া থাকিতে হইত। বণিকেরা ক্রমে-ক্রমে হইয়া পড়িতেছিল একালের ধনিক, আর কারি-

গরেরা ধীরে-ধীরে মজুরির দাসত্বে নামিয়া যাইতেছিল। ছোটো-ছোটো কারখানার সৃষ্টিও দেখিতে পাই—পরবর্তী যুগের মিল ও ফ্যাক্টরির পূর্বাভাস এইখানে। এই কারখানায় ধর্মঘট দেখা গেল—শ্রেণীযুদ্ধের নূতন এই রূপ এখানে প্রকাশ পায়। ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে কাপড়ের ব্যবসায়ে ধনতন্ত্র প্রথম নিজের মূর্তি ধরে।

গ্রামে ছোটো চাষীদের তাড়ানো আর তাহাদের জমি দখলও এই যুগের বৈশিষ্ট্য। আসল ফিউডাল সমাজে ঠিক ইহার উল্টা ব্যবস্থা দেখি, তখন চাষীকে গ্রামে আটকাইয়া রাখাই ছিল উদ্দেশ্য। এখন পশ্চিম ইওরোপে সার্ফ প্রথা উঠিয়া গেল; অবশ্য যে-সব চাষী গ্রামে টিকিয়া রহিল তাহাদের উপর জমিদারের চাপ কিছুমাত্র কমিল না। মধ্যযুগে গ্রামের সাধারণ জমিতে সকল চাষীর কিছু অধিকার থাকিত, যেমন গোরু চরাইবার দাবির উল্লেখ করা যায়। এবার গ্রামের সাধারণ জমিগুলিও জমিদার ও বড়ো চাষীরা ভাগ করিয়া লইল, তাহারা বেড়া দিয়া নিজেদের সম্পত্তি আলাদা করিয়া ফেলে। টিউডর আমলে দেখি, এই বেড়া দেওয়ার প্রথার প্রতিবাদ সারা ইংল্যাণ্ড মুখরিত করিতেছে। গ্রামের বড়োলোকেরা এবার ভেড়া চরাইবার বন্দোবস্ত করিয়া অথবা উন্নত ধরনের চাষের সাহায্যে নিজেদের সম্পদ বাড়াইতে থাকে। ভেড়ার পশমের চাহিদা বাড়িতেছিল; নূতন পদ্ধতিতে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। চাষীরা দলে-দলে গ্রাম হইতে উৎখাত হইয়া কাজের খোঁজে রাস্তায় বাহির হইতে লাগিল; এই বেকার লোকেরা একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। এলিজাবেথের সময় শান্তিরক্ষার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের ইহাদের কিছু-কিছু সাহায্যের বন্দোবস্ত পর্যন্ত করিতে হয়, সঙ্গে-সঙ্গে অবশ্য মালিকেরা তাহাদের উপর কড়া শাসনের ব্যবস্থাও করিয়াছিল। বেকার চাষীরা অনেকে যায় শহরে কাজের খোঁজে। যখন মিল ও ফ্যাক্টরি গড়িয়া উঠিতে থাকে, তখন ইহাদের মধ্যে অনেকেই মজুর শ্রেণীতে ভিড়িয়া গেল।

বিদেশে বাণিজ্য বিস্তারের দিকে প্রথম কথা নূতন দেশ আবিষ্কার। প্রাচ্যদেশের সঙ্গে মশলা প্রভৃতি আনিবার কারবার ইটালীয় বণিকদের হাতে ছিল। পনেরো শতকে তুর্কীদের দিগ্বিজয়ের পর সেই বাণিজ্যে বাধা দেখা যায়। জলপথে ভারতবর্ষে পৌঁছিতে পারিলে বাণিজ্য ফাঁপিয়া উঠিবে ভাবিয়া পশ্চিম ইওরোপের বণিকেরা তখন

সাগর পাড়ি দিতে আরম্ভ করিল। পর্তুগালের প্রতিনিধি ভাস্কো ডা গামা ১৪৯৮ সালে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া ভারতবর্ষে পৌঁছিলেন। তাহার ছয় বৎসর আগে স্পেনের কর্মচারী কলম্বাস পৃথিবী ঘুরিয়া ভারতে পৌঁছিবার চেষ্টায় আমেরিকায় গিয়া হাজির হইলেন। ইহার পর আফ্রিকা ও এশিয়ার উপকূলে পর্তুগীজ বণিকেরা এবং নূতন মহাদেশ আমেরিকায় স্পেনের লোকেরা সাম্রাজ্য গড়িল। অ্যাট্‌লান্টিক মহাসাগরের কূলের অন্য দেশগুলি—ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড—পরে নূতন আবিষ্কৃত দেশগুলিতে ভাগ বসায়। দেশ আবিষ্কারের জন্য জলযাত্রায় আমরা সেকালের নাবিকদের অসাধারণ কৃতিত্ব ও সাহস দেখিতে পাই। কিন্তু তাহার পিছনে ছিল বণিকদের অর্থবল ও উৎসাহ, আর রাজাদের উপর তাহাদের প্রভাব।

নূতন-নূতন বাণিজ্যের উপকরণ ও লুটপাটের সম্ভাবনা জোগাড় হওয়াতেই উৎসাহ বাড়িয়া চলে। আফ্রিকার উপকূল হইতে হাতীর দাঁত, সোনা আর নিগ্রো-দাস সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হইল; আমেরিকা হইতে রুপা আর সে-দেশের তামাক প্রভৃতি নিজস্ব নানা জিনিস পাওয়া গেল। বণিকেরা দলবদ্ধ হইয়া বাণিজ্যে নামিতে থাকে—ষোলো ও সতেরো শতকে বড়ো-বড়ো কোম্পানি গড়িয়া ওঠে, তাহার মধ্যে ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আমাদের দেশের ইতিহাসে সুপরিচিত। রাজারা এই কোম্পানিদের নানাভাবে সাহায্য করে, তাহাদের লাভের কিছুটা অবশ্য রাজাদের ভাগে আসিতে থাকে। কিন্তু তখনকার বাণিজ্য কিছু সমানে-সমানে কারবার ছিল না। ইওরোপীয় বণিকেরা অকিঞ্চিৎকর সামান্য জিনিস চালান করিয়া তাহার বদলে দামী দ্রব্য আদায় করিতে সিদ্ধহস্ত ছিল; আর অনেক ক্ষেত্রে আসল বাণিজ্যের বদলে লুটপাটের ব্যবস্থাই বেশি চোখে পড়ে। আফ্রিকার কূলে নিগ্রো ধরিয়া তাহাদের বাজারে দাসরূপে বিক্রয় করাটা লাভের একটা মস্ত উপায় ছিল। যেখানে সাম্রাজ্য গড়িয়া ওঠে, সেখানে আদিবাসীদের শোষণ বাণিজ্যের চাইতেও ছিল বেশি লাভজনক। উত্তর আমেরিকার আদিম আদিবাসীরা এবার প্রায় লোপ পাইতে বসিল, দক্ষিণ আমেরিকার লোকদের অবস্থা হইল দাসদের শামিল। সঞ্চিত রত্নভাণ্ডার বিদেশীরা লুট করিয়া লইল, খনিতে ও ক্ষেতের কাজে নূতন প্রভুরা দেশবাসীদের খাটাইতে লাগিল অনেক সময় অমানুষিকভাবে। দুই হাতে লুটিয়া

অসংখ্য লোক বড়োলোক হইয়া গেল। খালি জমিতে ইওরোপীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়া আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে। অজস্র সোনা ও রুপা ইওরোপে আসিয়া জমা হওয়াতে জিনিসপত্রের দাম চড়িয়া যায়; তাহাতে গরিবদের হইল বিশেষ অসুবিধা, বণিকদের আসিল লাভ।

স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বণিকযুগের এই আবহাওয়ায় প্রাচীন ধর্মমতের পরিবর্তন খুব স্বাভাবিক, ষোলো শতকের রিফর্মেশনে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। ক্যাথলিক ধর্ম ও আচার-ব্যবহারে সংস্কারের চেষ্টা মধ্যযুগেও অনেকবার হয়, কিন্তু তখন সংস্কারকদের পিছনে কোনো প্রবল শ্রেণীর সমর্থন না-থাকাতে সকল চেষ্টা হয় ব্যর্থ, মধ্যযুগের হেরেটিক বা বিধর্মীরা শুধু চার্চের হাতে শাস্তিই ভোগ করিত। বণিকযুগের প্রসারের সময় ইহার অন্যথা দেখি। তখন অনেকের, বিশেষত বণিক ও নূতন ধনিকদের মনে হইতে লাগিল যে, ক্যাথলিক চার্চ নূতন আর্থিক ব্যবস্থার পথে বাধাস্বরূপ। চার্চ প্রাচীন ফিউডাল-প্রথাকে আঁকড়াইয়া ছিল; দেশের অনেক জমি পুরোহিতদের হাতে সেকালের পদ্ধতিতে চাষ হইত; বণিকদের অযথা লাভ, মহাজনদের সুদের কারবার, প্রতিযোগিতা ও কাড়াকাড়ির মধ্যে সম্পত্তিবৃদ্ধি, আর্থিক জীবনে উন্নতির খোঁজে ধর্মের বিধি-বিধান অগ্রাহ্য করা—ইত্যাদি ব্যাপারে চার্চের উৎসাহ ছিল না। ক্যাথলিক চার্চও ছিল শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সে শোষণ সেকালের ফিউডাল শোষণ; তাহার প্রতিবাদ দেখা যায় চাষীদের বিদ্রোহের মধ্যে। প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম মোটামুটি নূতন ধরনের শোষণের পক্ষপাতী ছিল। চার্চের প্রভুত্ব ভাঙিতে প্রটেস্টাণ্ট সম্প্রদায় বিপ্লবের পথে পা বাড়ায়, রিফর্মেশন আরম্ভ হইল বিপ্লবীরূপে। কিন্তু জনসাধারণের আর্থিক মুক্তিতে প্রটেস্টাণ্ট নেতাদের আগ্রহ ছিল না; তাই জার্মানির প্রজাবিদ্রোহের ও ধর্মের পূর্ণ সংস্কারের চেষ্টার প্রতিবাদ করিতে প্রটেস্টাণ্ট নেতারা লুথারের নেতৃত্বে দ্বিধা করিল না; শাসকদের প্রজাবিদ্রোহ দমনকে তাহারা করিল সমর্থন। পশ্চিম ইওরোপের ক্যাল্‌ভিনিস্ট সম্প্রদায় লুথারের চাইতে বেশি বিপ্লবী ছিল; কিন্তু সেখানেও দেখি বুর্জোয়া স্বার্থসিদ্ধিটুকুর পর সাধারণ লোকের মুক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহেলা। তবুও ফিউডাল-প্রথার বড়ো সহায় ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতা রিফর্মেশনের ফলে ভাঙিয়া পড়ে। জেস্যুইট

ইত্যাদি ক্যাথলিক সংঘের আপ্রাণ চেষ্টায় পুরাতন ধর্ম দক্ষিণ ইও-রোপে বজায় রহিল বটে, কিন্তু ফ্রান্স প্রভৃতি সেই-সব দেশে চার্চকে নূতন আর্থিক বন্দোবস্তের সঙ্গে রফা করিয়া লইতে হয়। রিফর্মে-শনে মোট লাভ হইল বণিক ও ধনিকদের, ইওরোপের সাধারণ জীবনযাত্রার ধরন তাহাদের স্বার্থের উপযোগী রূপ লইতে লাগিল। চার্চের সম্পত্তি লুট করিতে পারাও ছিল তাহাদের এক মস্ত লাভ। এই কাজে ভাগ বসাইতে পারাতে রাজারা ও জমিদারেরা অনেক সময় চার্চের বিরুদ্ধে যায়। সাধারণ লোকের মধ্যে জাতীয়তার ভাব পোপের ক্ষমতা নষ্ট করিবার কাজে সহায় হইয়াছিল, কিন্তু রিফর্মে-শনে তাহাদের বিশেষ আর্থিক লাভ দেখা যায় নাই। ফিউডাল শোষণের বদলে বণিকদের দ্বারা শোষণের পথ এবার আরো পরিষ্কার হইল। হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে তাহার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বুর্জোয়া অভ্যুদয়ের আর-একটি দিক দেখা যায় বিজ্ঞানচর্চায়। বারুদের ব্যবহার যুদ্ধে বন্দুক-কামানের ভিতর দিয়া রূপান্তর আনিল। দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্র-যাত্রা সহজ হইয়া আসে। কাগজ ও ছাপার উদ্‌ভাবনায় বুর্জোয়া বিদ্যার বিস্তার সম্ভব হয়। জ্যোতিবিদ্যার উন্নতি উল্লেখযোগ্য। কোপারনিকাস প্রমাণ করিলেন যে, পৃথিবী লাটিমের মত ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে; ব্রুনো দেখাইলেন যে, সূর্য ও গ্রহগুলি নক্ষত্রজগতের সামান্য অংশ মাত্র; কেপ্‌লার গ্রহ প্রভৃতির গতি নির্ধারণ করেন; গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কর্তা; নিউটন মাধ্যাকর্ষণ বলের হিসাব বাহির করিলেন; লাইব্‌নিৎস্‌ও তিনি অঙ্কশাস্ত্রের অশেষ উন্নতি করেন; ডেকার্টে একাধারে দার্শনিক ও গণিতবিদ। গতিবিজ্ঞান গড়িয়া উঠিল, গ্রহ-নক্ষত্র পর্যন্ত কী-নিয়ম মানিয়া চলে তাহা বোঝা গেল। রসায়নশাস্ত্র আরম্ভ হইল বয়েল্‌-এর কাজের মধ্যে। হার্ভে শরীরের ভিতর রক্ত-সঞ্চালনের নিয়ম বাহির করেন। প্রচলিত বিশ্বাসের উপর নির্ভর না-করিয়া প্রকৃতির জগৎকে যাচাই করিয়া দেখা বিজ্ঞানের মূলসূত্র; বেকন সতেরো শতকের গোড়াতে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে চিন্তার জগতে স্থায়ী রূপ দিলেন। চৌদ্দ ও পনেরো শতকের রেনেসাঁসে বিজ্ঞানের পথ পরিষ্কার হয়, কিন্তু নূতন বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিতে থাকে ষোলো ও সতেরো শতকে। বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিপত্তি, আর্থিক

উন্নতির উদ্যম, ও নূতন অনুসন্ধানে কৌতূহল বিজ্ঞান-চর্চার প্রেরণা আনিয়া দিল। জড়বিজ্ঞান ও এমন-কি গণিতের অনুশীলনের পিছনেও তখনকার ব্যবহারিক জীবনের বহুবিধ তাগিদ অনেকাংশে ছিল, এ কথা এখন বহু পণ্ডিত স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বণিকযুগের শেষ বৈশিষ্ট্য উদার-নীতির আবির্ভাবে। সতেরো শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে তাহার প্রথম প্রতিষ্ঠা দেখি। কেন্দ্রীভূত নিউ মনার্কিতে রাজা শোষকদের রক্ষী ছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের নূতন জমিদার ও বুর্জোয়া বণিকেরা দেখিল যে, অবাধ রাজতন্ত্রে সুবিধার মতো অসুবিধাও আছে। ফিউডাল জমিদারদের প্রতিপত্তি একেবারে শেষ হয় নাই, স্টুয়ার্ট রাজারা অনেকখানি তাহাদের হাতে গিয়া পড়ে। রিফর্মেশনের পরও ইংল্যাণ্ডের চার্চ অনেকখানি প্রাচীনপন্থী থাকিয়া যায়, অথচ বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ক্যাল্‌ভিনিস্ট প্রভৃতি বেশি অগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল—তাই ধর্ম লইয়া আবার বিরোধ দেখা দেয়। বণিকদের ক্ষমতাবৃদ্ধি রাজার মনঃপূত ছিল না, রাজ-শক্তি ক্রমে বুর্জোয়া শ্রেণীর সহায়তার চাইতে বাধারই সৃষ্টি করিতে থাকে। ইংল্যাণ্ডের বিশেষ অবস্থায় ফিউডাল যুগেই পার্লামেণ্ট নামক স্থায়ী প্রতিনিধি-সভার উৎপত্তি হয়, এতকাল পর্যন্ত সেই সভা রাজার হাতেই ছিল বলা চলে। এখন নূতন জমিদার, বণিক ও ধর্ম-সংস্কারকদের প্রভাব পার্লামেণ্টে বাড়িয়া চলিল। সতেরো শতকে রাজার সঙ্গে পার্লামেণ্টের অধিকাংশের বারবার সংঘর্ষ হইতে রাজাকে সমর্থন করিত ফিউডাল জমিদার ও প্রাচীনপন্থী পুরোহিতেরা। দেশের বণিক ও শিল্পপ্রধান অংশগুলি পার্লামেণ্টের দলে রহিল। ইংল্যাণ্ডের সুবিখ্যাত গৃহযুদ্ধ ইহার ফল। পরাজিত রাজা প্রথম চার্লস্‌-এর প্রাণদণ্ড হয় ; তাহার পর ইংল্যাণ্ড ক্রমওয়েল-এর আমলে বারো বৎসর রিপাবলিক ছিল। তখন দেখা গেল যে, বিজয়ী নেতারা ও তাহাদের দলের লোকেরা সাধারণ প্রজার স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করে নাই, বুর্জোয়া স্বার্থের সংরক্ষণই ছিল প্রধান লক্ষ্য। প্রাচীন জমিদারিগুলি কাড়িয়া লইয়া ভাগ করিবার চেষ্টা, বণিকদের স্বার্থে হল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ, স্পেনের কাছ হইতে উপনিবেশ কাড়িয়া লওয়া, বাণিজ্যের সুবিধার জন্য আইন-কানুন ইত্যাদি ব্যাপারে নেতাদের আগ্রহ ছিল। কিন্তু আর্থিক শোষণ বন্ধ করিবার চেষ্টা কিংবা সাধারণ লোকের পূর্ণ রাষ্ট্রিক অধিকারের দাবি পূর্ণ করিবার কোনো

লক্ষণ দেখা গেল না। এই-সব দাবির সমর্থকদের বরং দমন করিতে কোনো ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু পুরোপুরি বুর্জোয়া রাজত্বের সময় তখনো আসে নাই, অল্পদিনের মধ্যে স্টুয়ার্ট রাজাদের ফিরাইয়া আনা হয়। রাজা আবার স্বেচ্ছাচার আরম্ভ করায় ১৬৮৮ সালে স্টুয়ার্টদের তাড়াইয়া নূতন রাজবংশ আনা হইল। ইহার পর বুর্জোয়া প্রভুত্বের পথ ইংল্যাণ্ডে পরিষ্কার হয়। বণিক, মহাজন, নূতন জমিদার প্রভৃতি রাষ্ট্রশক্তিকে নিজেদের আয়ত্তে আনিয়া ফেলে, কিন্তু তাহাদের সকলকে গ্রাস করিয়া নূতন ধনিক শ্রেণীর অভ্যুদয় তখন আগত-প্রায়।

সতেরো শতকের ইংরাজ বিপ্লবের আমলে বিজয়ী প্রজাশক্তি বুর্জোয়া বণিকদের নেতৃত্বে উদার-নীতির সুবিখ্যাত মতবাদ প্রথম গড়িয়া তুলিয়াছিল। তখন প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রজার প্রতিনিধি-সভার চাপে অবাধ রাজশক্তিকে সংকুচিত করিয়া নিয়মের মধ্যে আনা, ইহারই নাম হইল নিয়মতন্ত্র অর্থাৎ কনস্টিটিউশন। অন্য লক্ষ্য, ব্যক্তিবিশেষের নিজ মত প্রকাশ, স্বাধীন চলাচল ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষ অধিকার আইনের জোরে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। অবশ্য এ-অধিকারগুলি আসলে বুর্জোয়া আর্থিক বৃত্তির বিস্তার ও সমাজে বুর্জোয়া প্রাধান্যেরই পথ পরিষ্কার করিতে থাকে।

ইংল্যাণ্ডে উদার-নীতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আঠারো শতকে আমেরিকার উপকূলে ইংরাজ উপনিবেশগুলিতে সাড়া পড়িয়া যায়। এখানে কোনো কালেই ফিউডাল সমাজ গড়িয়া ওঠে নাই, উপ-নিবেশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বণিকযুগে মাত্র। উপনিবেশের ইংরাজ অধিবাসীরা মাতৃভূমির কর্তাদের চাপে বিরক্ত হইয়া সাগরপারে নিজেদের জাতীয়তা গঠন ও স্বাধীনতা অর্জনের দিকে ঝুঁকিতে থাকে। আমেরিকার স্বাধীনতা-সমর আসিল ১৭৭৬ সালে, ইংরাজ অধিকার লোপ পাইল ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে। এই আমেরিকান বিপ্লবে দ্বিতীয়বার উদার-নীতির জয় ঘোষিত হইল। ১৭৮৭ সালে এ-অঞ্চলে আমেরিকার প্রসিদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হওয়াতে আধুনিক পৃথিবীর দ্বিতীয় নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হয়।

পূর্ণ ধনিকতন্ত্রের সমাজ

ক্যাপিটালিজম্-এর শৈশব অবস্থা বণিকযুগের মধ্যে, কিন্তু তাহার পরিণতিই ইওরোপের ইতিহাসে প্রকৃত যুগান্তর আনিল বলা যায়। গত আড়াই শত বৎসর আসল ধনিকতন্ত্রের যুগ। এবার আমাদের ইহার কথা আলোচনা করিতে হইবে।

ধনতন্ত্র গড়িয়া উঠিলে দেখিতে পাই সমাজে এখন মূল শ্রেণী দুইটি—ধনিক ও শ্রমিক, তাহারা পরস্পর-বিরোধী, তাহাদের দ্বন্দ্বের সমাধান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সম্ভব নয়। মূল দুই শ্রেণীর পাশে অন্যান্য শ্রেণী ধনতান্ত্রিক সমাজে থাকিয়া যায়, কিন্তু তাহাদের প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। জমিদার, বণিক, মহাজন প্রভৃতি শ্রেণী এখন ধনিক শ্রেণীর সহিত নিবিড় যোগে সংশ্লিষ্ট; ইহারা সকলেই বুর্জোয়া, যদিও জমিদারের মধ্যে প্রাচীন ফিউডাল আভিজাত্যের চিহ্ন থাকে, এবং কোনো-কোনো দেশে ফিউডাল-প্রথায় চাষীর শোষণ আংশিক ভাবে টিকিয়া যায়। কিন্তু বুর্জোয়াদের নেতৃস্থানীয় এখন পুঁজিপতি ধনিকেরা, যাহারা উৎপাদনের কাজে মূলধন খাটাইয়া মজুরদের দ্বারা পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করাইতেছে, তাহাদের সঙ্গে বণিক অথবা জমিদারদের ছোটোখাটো বিরোধ দেখা যায়, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংল্যাণ্ডে যেমন ধনিকদের অবাধ বাণিজ্যের দাবিতে জমিদারদের আপত্তি ছিল, কিংবা ইংরাজ রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন টোরি দল সাধারণত জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলিত আর হুইগ দল করিত বণিক ও ধনিকদের স্বার্থসন্ধান। কিন্তু এই-সব লড়াই আসলে ঘরোয়া বিবাদ, সাধারণ লোকের উপর শোষণের লাভ লইয়া ভাগাভাগি ঝগড়া। ফিউডালপন্থী জমিদারদের কথা ছাড়িয়া দিলে বলা যায় যে, এখন শোষণের আসল কাজটি থাকে ধনিকদের হাতে। ধনিককে লাভের কিছু অংশ দিতে হয় জমির মালিককে, কিছুটা বণিকদের, আর কিছু মহাজনকে; যাহা বাকি থাকে তাহাই হইল ধনিকের নিজস্ব মুনাফা। সকল বুর্জোয়া শ্রেণী তাই পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে যুক্ত এবং তাহাদের মধ্যে ধনিকেরাই কেন্দ্রস্থানীয়।

বুর্জোয়াদের পর সমাজে স্থান পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীগুলির।

তাহাদের আমাদের ভাষায় মধ্যবিত্ত বলা চলে, বুর্জোয়ার প্রতিশব্দ হইল বিত্তশালী অথবা সম্পত্তিবান। এই পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে পড়ে ছোটো-ছোটো স্বাধীন ব্যবসায়ী, স্বাধীন কারিগর, দোকানদার প্রভৃতি এবং কৃষকেরা। ধনতান্ত্রিক সমাজে পেটি-বুর্জোয়াদের মধ্যে ক্রমাগত স্তরভেদ হইতে থাকে; ইহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোক অর্থলাভ করিয়া, অন্যদের খাটাইয়া আসল বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করে। অন্যদিকে বেশির ভাগ পেটি-বুর্জোয়ার আর্থিক দুরবস্থা বাড়িয়া চলে, তাহারা ধনিকদের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে, তাহাদের আর্থিক স্বাধীনতা কমিতে-কমিতে মজুরদের মতন হইতে থাকে। অধিকাংশ কৃষকদের ভাগ্যে জোটে এই অবনতি; তাই ধনতন্ত্রের আমলে গরিব কৃষকদের সঙ্গে মজুরদের সংযোগ স্বাভাবিক।

বুর্জোয়া এবং পেটি-বুর্জোয়া বাদ দিলে বাকি থাকে শ্রমিক বা মজুর শ্রেণী—মার্কসবাদে যাহার নাম প্রোলেটারিয়াট অথবা নিঃস্ব শ্রেণী। এই মজুর ব্যতীত ধনতন্ত্রে উত্তরণ অসম্ভব। মার্কসের মতে আজকের দিনে সার্থক বিপ্লব আসিতে পারে একমাত্র মজুর শ্রেণীর নেতৃত্বে, ধনতান্ত্রিক শোষণ শেষ করা প্রধানত ইহাদেরই স্বার্থ। কিন্তু মজুরদের মুক্তি মানেই সমাজের এমনভাবে পুনর্গঠন যে, তখন শ্রেণীভেদ উঠিয়া যাইতে থাকিবে। শ্রেণীহীন সমাজের অন্য নাম সাম্যতন্ত্র, তাই মজুর শ্রেণীর মুক্তির আন্দোলন হইল সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার প্রধান উপায়।

ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রধান বিশেষত্ব হইল একদিকে পুঁজিপতি ধনিক শ্রেণী, অন্যদিকে সর্বহারা মজুর শ্রেণী। ইহাদের সম্বন্ধের উপর সমাজের আর্থিক গড়ন নির্ভর করিতেছে। উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলি ধনিকদের সম্পত্তি; তাহাদের হাতে রহিয়াছে জমির কর্তৃত্ব, কাঁচা মাল, উৎপাদনের যন্ত্রগুলি, অর্থবল ইত্যাদি। কিন্তু উৎপাদনের আসল কাজ ধনিকেরা করে না, তাহাদের উপর শুধু তদারকের ভার, তাহাও আবার বেশির ভাগ সময় বেতনভোগী কর্মচারীদের উপর দেওয়া হয়। উৎপাদনের আসল পরিশ্রম মজুরদের ভাগে পড়ে। মজুরেরা নিঃস্ব, তাহাদের কোনো সম্পত্তি থাকে না, তাই তাহাদের পক্ষে ধনিকদের কাছে কাজ লওয়া ছাড়া গতি নাই। মজুরের একমাত্র সম্পত্তি দৈহিক শক্তি, খাটিবার ক্ষমতা। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহাকে দিনের পর দিন সেই শক্তি বেচিতে হয়

মালিকদের কাছে। তাহার পরিবর্তে সে পায় মজুরি, মজুরির অর্থে তাহার কোনোক্রমে খাওয়া-পরা চলে। মজুরের প্রতিদিনের পরিশ্রমের খানিকটায় তাহাকে যতটা মজুরি দেওয়া হইয়াছে এবং কাঁচা মাল ইত্যাদির জন্য যে অর্থ নিয়োগ হইল তাহার মূল ধনিক ফিরিয়া পায়; কিন্তু বাকি অংশটায় মজুর যাহা উৎপাদন করে তাহাও মালিকের প্রাপ্য, সেই অংশ মালিকের লাভ। ধনতান্ত্রিক শোষণের মূল রূপ হইল এই।

আগেকার ব্যবস্থা হইতে ইহার পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। কাঁচা মাল অথবা যন্ত্রপাতি শ্রমিকের সম্পত্তি নয়, শ্রমিক যাহা উৎপাদন করে তাহাতে তাহার কোনো অধিকার নাই, তাহার সমস্তটাই ধনিকের সম্পত্তি। সেকালের কারিগর নিজের প্রস্তুত পণ্য বিক্রয় করিত, মধ্যবিত্ত স্বাধীন কারিগর এখনো তাহাই করে। একালের মজুর পণ্য বিক্রয় করে না, সে বেচে তাহার খাটিবার শক্তি। বণিক-যুগে আমরা মাঝামাঝি একটা অবস্থা দেখিতে পাই; তখনো হাতিয়ারগুলি থাকে কারিগরদের সম্পত্তি। ধনিকযুগে উৎপাদনের যন্ত্রে শ্রমিকদের কোনো অধিকার নাই, যতই মজুরি দেওয়া হউক-না-কেন, মজুরেরা বিত্তহীন নিঃস্ব শ্রেণী। শোষণের আবার রূপান্তর হইয়াছে দেখিতে পাই।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুরোপুরি গড়িয়া উঠিল উৎপাদনের যে-নূতন প্রণালার মধ্যে, ইতিহাসে তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে শিল্প-বিপ্লব। আঠারো শতকের ইংল্যাণ্ডে তাহার প্রকাশ, উনিশ শতকে তাহার পরিণতি। ইংল্যাণ্ড হইতে নূতন পদ্ধতি ইওরোপের অন্যত্র, ক্রমে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে প্রথম কথা যন্ত্রের ব্যবহার, হাতিয়ারের পরিবর্তে কলের নিয়োগ। আর্করাইট ও হার-গ্রীভস্ সুতা কাটিবার যন্ত্র বাহির করেন; কলের তাঁত সৃষ্টি করিলেন কার্টরাইট। ওয়াটের আবিষ্কৃত স্টীম-এঞ্জিন সকল প্রকার কল চালাইবার কাজে লাগিল। তাহার সহিত আসিল লোহা গলাইবার ও ইস্পাত প্রস্তুত করিবার নূতন প্রণালী এবং কয়লার উৎপাদন বাড়াইবার উপায়। একটির পর একটি নূতন উদ্ভাবনের ফলে নূতন শিল্পের সৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু নূতন কৌশলের উদ্ভাবনে ধনতন্ত্র আসিতে পারে না—একদিকে পুঁজিপতি ধনিক, অন্যদিকে নিঃস্ব শ্রমিক না-থাকিলে

কলের ব্যাপক ব্যবহার চলিতে পারিত না। কলের কাজ বড়ো কারখানা ছাড়া চালানো অসম্ভব—তাই এবার মিল ও ফ্যাক্টরি দেখা দিতে লাগিল। বাড়িতে বসিয়া কারিগরদের কাজের আর সুবিধা থাকিল না, কারখানায় হাজার-হাজার মজুর খাটানো আরম্ভ হইল। এমন-কি, চাষের কাজেও কিছুকিছু কলের আয়োজন দেখা যায়; কিন্তু চাষীদের ছোটো-ছোটো ক্ষেতে কল চলে না, যেখানে অনেকখানি জমি একসঙ্গে চাষ করা সম্ভব সেখানেই কল চলিল। বড়ো কারখানা ও বড়ো ক্ষেতে উৎপন্ন জিনিস কলের কল্যাণে শস্তায় বেচা সম্ভব; তাই ছোটো কারবার ধ্বংস হইতে লাগিল, ছোটো চাষীদের দুর্দশার অন্ত রহিল না। মিলের কাপড় বেচার ফলে ইংল্যাণ্ডের ছোটো তাঁতিদের সর্বনাশ হইয়া যায়। ধনিকদের পণ্য সহজে ও শস্তায় বাজারে ছড়াইবার সুবিধা হইল নূতন রেল ও স্টীমারের সাহায্যে। পরে ইলেকট্রিক শক্তির ব্যবহারে কলের কাজ আরো বিস্তার লাভ করে। কল প্রস্তুত করার কাজেও অসংখ্য লোক খাটিতে লাগিল।

ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লব অমানুষিক অত্যাচারের সূচনা করে। প্রথমে মজুরদের খাটানোর সময়ের কোনো সীমা ছিল না, দিনে বারো বা চৌদ্দ ঘণ্টা খাটা ছিল খুবই সাধারণ। রাত্রেও কলের কাজ চলিত, কারখানার মধ্যে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার তুলনা পাওয়া যায় না। বেশির ভাগ কলের কাজে দক্ষতার দরকার ছিল না, সাধারণ লোকে সহজেই কাজ শিখিয়া লইতে পারিত; তাই মজুরি ছিল সামান্য। দেশে নিঃস্ব লোকের সংখ্যা বাড়িয়াই চলে, তাই মজুরের কখনো অভাব হয় নাই। অসংখ্য মেয়ে ও ছোটো শিশু পর্যন্ত কলের কাজে ঢুকিল, তাহাদের কষ্টের আর সীমা ছিল না। কারখানার চারিধারে নূতন যে-সব শহর গড়িয়া ওঠে, সেখানে মজুরের থাকিবার বস্তিগুলির অবস্থা হইল জঘন্য। একদিকে মালিকদের বিপুল অর্থলাভ, অন্যদিকে মজুরদের ভয়াবহ দুর্দশা—ধনতান্ত্রিক শোষণের প্রকাশ হইল এইভাবে। ইংল্যাণ্ডের সরকারী রিপোর্টগুলিতে পর্যন্ত ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিছুদিন পর ফ্যাক্টরি আইনগুলিতে মজুরদের অবস্থার খানিকটা উন্নতি হয়। ফ্যাক্টরি আইন করার আবশ্যক ছিল এই যে, তাহা না-হইলে মজুরদের অসন্তোষে সমস্ত আর্থিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িতে

পারিত। কিন্তু ফ্যাক্টরি আইনে শোষণের শেষ হয় না, তাহাকে কতকগুলি নিয়মের বাঁধনে বাঁধা হয় মাত্র। শ্রমিকদের শোষণ চলিয়া আসিতেছে প্রায় সমানভাবেই। কাজের ঘণ্টা কমিয়াছে, কিন্তু কলের উন্নতি ও গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাজের তীব্রতা, পরিশ্রমের পরিমাণ বাড়িয়াছে; মজুরি হয়তো আগের চাইতে বেশি দেওয়া হয়, কিন্তু মজুরের খাওয়া-পরার খরচ বাড়ে আরো বেশি; কারখানা আগের চাইতে স্বাস্থ্যকর হইয়াছে, কিন্তু কাজ জোটা শক্ত, বেকারের সংখ্যা এখন অনেক বেশি। মনে রাখিতে হইবে যে, মজুরদের প্রতিদিনকার অবস্থা যাহাই হউক-না-কেন, শোষণের প্রকৃতির বিশেষ বদল হয় নাই; একমাত্র নূতন সমাজ গঠনের মধ্যেই সেই শোষণ শেষ হইতে পারে। ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে যেখানে যেখানে ধনতন্ত্র বিস্তার লাভ করিল, সর্বত্রই মজুরদের দুর্দশা ও সমাজে তাহাদের অবস্থার প্রকৃতি হইল একই ধরনের।

আর্থিক পরিণতির দিক দিয়া আঠারো শতকের ইংল্যাণ্ড ছিল সব চাইতে অগ্রসর দেশ, শিল্প-বিপ্লব ও ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ সেখানেই প্রথম সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সতেরো শতকের রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডে রাজশক্তি বুর্জোয়াদের আয়ত্তে আসিয়াছিল, তাই ধনতন্ত্রের পরিপূর্ণ প্রকাশের পথে রাষ্ট্র এখানে সহায় ছিল, কোনো বাধাসৃষ্টির চেষ্টা পর্যন্ত করে নাই। কিন্তু ইওরোপের অন্যান্য দেশের অবস্থা ছিল স্বতন্ত্র। সেখানে বুর্জোয়া শ্রেণী বর্ধিষ্ণু হইলেও অনেকদিন অতখানি শক্তিশালী হইতে পারে নাই। পূর্ব ইওরোপে ফিউডাল-প্রথা তখনো সুপ্রতিষ্ঠিত; পশ্চিম ইওরোপে, যেমন ফ্রান্সে, ফিউডাল ব্যবস্থার প্রধান বিশেষত্ব অনেকগুলি লোপ পাইলেও ফিউডাল কর্তৃত্ব ও প্রভাব শেষ হয় নাই, রাজশক্তিও বুর্জোয়াদের হাতে আসিয়া পড়ে নাই। শিল্প-বিপ্লব ও ধনতন্ত্রের পথে তাই ইওরোপে বিস্তর বাধা ছিল, তাহার মধ্যে পুরা-ফিউডাল ও আধা-ফিউডাল শ্রেণীর স্বার্থে চালিত প্রাচীনপন্থী রাষ্ট্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধনতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কারের জন্য ইওরোপে প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রবিপ্লবের; সুবিখ্যাত ফরাসী বিপ্লব তাহারই সূচনা করে।

ফরাসী বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ করে বুর্জোয়া শ্রেণী। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল সমাজে ফিউডাল প্রভাব ও ফিউডাল-প্রথার অবশিষ্ট

অংশ ও চিহ্ন শেষ করিয়া দেওয়া। দেশের অনেক জমি তখনো প্রাচীনপন্থী জমিদার ও চার্চের পুরোহিতদের হাতে; বাণিজ্যের অবাধ চলাচলের পথে ছিল বিস্তর বিঘ্ন; কারখানার বিস্তারে বাধা ছিল সেকালের আইন-কানুন; টাকা খাটাইবার অনেক পথ খোলা ছিল না; অভিজাতদের ও পুরোহিতদের সোজাসুজি ট্যাক্স দিতে হইত না বলিয়া বুর্জোয়া বণিক প্রভৃতির ঘাড়ে ট্যাক্সের ভার বেশি পড়িত; শাসনযন্ত্র, সৈন্যদল ও চার্চের উচ্চপদগুলি ফিউডাল বংশের লোকের একচেটিয়া ছিল। সমাজে বুর্জোয়াদের স্থান ছিল অভিজাত-বংশীয়দের নীচে; তাহাদের রাষ্ট্রিক ও নাগরিক অধিকার এবং রাজ্য-শাসনে কর্তৃত্বের ছিল অভাব। নিউ মনার্কি ও মার্কেণ্টাইল যুগে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী এই-সব অসুবিধা মানিয়া লইত, কিন্তু আঠারো শতকের শেষে ফ্রান্সে তাহারা চাহিল পূর্ণ-ক্ষমতার অধিকার। তাহাদের সৌভাগ্যক্রমে দেশের জনসাধারণও ছিল ফিউডাল অত্যাচারে জর্জরিত এবং অসন্তুষ্ট। সার্ফ-প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল, তবুও জমিদারদের নানা ধরনের অর্থের দাবী চাষীদের চাপিয়া রাখিয়াছিল; তাহা ছাড়া চার্চের প্রাপ্য ও রাজার ট্যাক্সের পরিমাণও কিছু অল্প ছিল না। শহরের গরীব লোকদের অভাবও ছিল প্রচণ্ড। দেশ-ব্যাপী অসন্তোষকে সংগঠিত করিয়াই ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লব আনে।

বিপ্লবে আসল সুবিধা হইল তাহাদেরই। অভিজাত ও পুরোহিতদের জমি কাড়িয়া লয় মধ্যশ্রেণী ও অবস্থাপন্ন কৃষকেরা; দেশের মধ্যে এবার আসিল বণিকদের স্বার্থের জন্য অবাধ বাণিজ্য, ধন-তান্ত্রিক প্রথায় উৎপাদনের নূতন পথ পরিষ্কার হইল; টাকা রোজগার ও খাটাইবার নূতন উপায় খুলিয়া গেল; দেশের রাজস্ব আদায় এখন নূতনভাবে হইতে থাকে; সকল উচ্চপদ বুর্জোয়াদের হাতে আসিয়া পড়ে। সেইসঙ্গে রাষ্ট্রশক্তি আসিল অভিজাতদের হাত হইতে বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে। সাধারণ লোকে ফিউডালদের ও চার্চের কর হইতে অব্যাহতি পাইল বটে, জমিতে কৃষকদের অধিকারও স্বীকৃত হইল, কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে, দেশে আসিয়াছে শুধু শোষণের রূপান্তর, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রথার পথে সকল বাধা ভাসিয়া গিয়াছে মাত্র, সাধারণ লোকের আর্থিক মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য সুদূর-পরাহত। ফরাসী বিপ্লবের অনুকরণে ইওরোপে পরে যত বিপ্লব

আসে, সকলেরই মূল প্রকৃতি এই। নেপোলিয়ানের আমলে ফরাসী ইওরোপ জয় করিয়া যে-মুক্তির আস্বাদ আনিল, তাহাতেও আসল কথা ফিউডাল প্রথার অবশিষ্ট অংশের উচ্ছেদ, বুর্জোয়া শ্রেণীর শক্তিলাভ, ধনতন্ত্রের পথে সকল বাধার অপসারণ, জনসাধারণের ভাগ্য শোষণের রূপান্তর।

ফরাসী বিপ্লব ও সেই জাতীয় অন্য প্রচেষ্টাগুলির সাধারণ নাম হইতেছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। ইহাতে সাধারণ লোকের লাভ হয় নিশ্চয়—ফিউডাল শোষণ ও কর্তৃত্বের শেষ হয়, প্রাচীন অচল অবস্থার হয় অবসান, আর্থিক উন্নতির পথ হয় পরিষ্কার। কিন্তু জনসাধারণের স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে বোঝা যায় যে, আধুনিক ইতিহাসে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব মুক্তির প্রথম সোপান মাত্র, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব না আসা পর্যন্ত শোষণের হাত হইতে নিস্তার নাই। মার্কসবাদের কল্যাণে আমরা এইখানে দুই রকম ভুল এড়াইতে পারি : বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, তাহার আবশ্যকতা অস্বীকার করা তাহার প্রয়োজন অবহেলা করা—এক প্রকারের ভুল। অন্য ভুল হইতেছে এই বিপ্লবকেই মূল লক্ষ্য করা, ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকা, এই বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করিবার চেষ্টা না করা।

ফরাসী কিংবা অন্য কোনো বুর্জোয়া বিপ্লবের বিশেষ রূপটি ফুটাইয়া তোলা এখানে সম্ভব নয়। এক ফরাসী দেশেই রাষ্ট্রবিপ্লবের ও প্রতিবিপ্লবের ঘাত-প্রতিঘাত চলে আশি বৎসর ধরিয়া। প্রত্যেক দেশেই দেখি স্থানীয় বিশেষত্ব এবং নূতন সমস্যা। কিন্তু তবুও উনিশ শতকের বিপ্লবগুলির একটা সাধারণ রূপ আছে। দেশের পর দেশে বিপ্লবের ফলে ধনতন্ত্র গড়িয়া উঠিবার পথে সকল বাধা ভাঙিয়া পড়িল। রাষ্ট্রশক্তি ফিউডাল স্বার্থে চালিত অবাধ রাজতন্ত্রের হাত হইতে বুর্জোয়া ধনিকদের হাতে আসিয়া পড়ে। কোথাও নিয়মতন্ত্রে বাঁধা রাজার শাসন, কোথাও রিপাবলিক; কোথাও জনসাধারণের ভোটের অধিকার, আবার কোথাও বা শুধু অবস্থাপন্ন লোকদের ভোট দিবার ক্ষমতা—রাষ্ট্রশক্তি যে রূপই লউক-না-কেন, এ-যুগের প্রধান কথা হইল ধনিক শ্রেণীর কর্তৃত্ব। সর্বত্রই আবার দেখি যে, নূতন ব্যবস্থায় শোষণের শেষ হয় নাই, রূপান্তর হইতেছে মাত্র। পূর্ণ গণতন্ত্রে সকলের ভোট দিবার অধিকার থাকিলেও ইহার অন্যথা হইল

না। তাহাতে প্রমাণ হয় আর্থিক ক্ষমতাই আসল বল। সকল রাষ্ট্রেই, এমনকি, পূর্ণ গণতন্ত্রেও, সমাজের আর্থিক গড়নে যাহারা মালিক শ্রেণী, তাহাদেরই স্বার্থে শাসনযন্ত্র চলে, তাহাদেরই হাতে প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা হইতে বোঝা যায় যে, সমাজে যতদিন শ্রেণীভেদ থাকিবে ততদিন শোষণ ও অত্যাচার লোপ পাইতে পারে না। মানুষের সকল হিতাকাঙ্ক্ষীর তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত শ্রেণীহীন সমাজ গঠন। একমাত্র সমাজতন্ত্রের আদর্শই আজ চিন্তাশীল মানুষের মনকে তৃপ্তি দিতে পারে।

ফরাসী বিপ্লবের ফলে জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজ্‌মের মধ্যেও নূতন প্রেরণা দেখিতে পাই। গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র ছিল আত্মশাসনের অধিকার। এখানে প্রথমেই আত্ম কী তাহার সংজ্ঞানির্দেশ আবশ্যক হইয়া পড়ে। নেশনকে স্বভাবতই একটা নির্দিষ্ট সত্তা হিসাবে ধরিলে গণতন্ত্র অনুসারে প্রত্যেক নেশনের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ঘোষণা করিতে হয়। পশ্চিম ইওরোপে ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সে আগে হইতেই সারা দেশ ও রাষ্ট্র জুড়িয়া এক নেশন গড়িয়া উঠিয়াছিল, কাজেই আত্মশাসনের নূতন রবে সেখানে জাতিগত কোনো গণ্ডগোল বা বিরোধ উপস্থিত হয় নাই। জার্মানি বা ইটালিতে ইতিমধ্যে এক নেশন গড়িয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল, তাই সেখানে উনিশ শতকে নূতন থিওরি একরাষ্ট্র স্থাপনের সহায় হইল। কিন্তু ধনতন্ত্র পূর্ব ইওরোপে ছড়াইয়া পড়িতে থাকিলে দেখা গেল যে, সে-অঞ্চলে পূর্ব-স্থাপিত রাষ্ট্রগুলির অধিকৃত ভূখণ্ডে এক জাতির বদলে বহু জাতির বসবাস। বুর্জোয়া চিন্তার প্রভাবে এই ভিন্ন-ভিন্ন জাতিগুলির মনে স্বাধীন নিজস্ব স্বরাষ্ট্র গড়িবার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল। তাই অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও তুর্কী সাম্রাজ্যে ফরাসী বিপ্লবের বাণী আনিয়া দেয় অন্তর্বিরোধ ও ভাঙনের আভাস।

উনিশ শতকে ধনতন্ত্রের দিগবিজয় সারা জগৎ গ্রাস করিল, প্রাচীন সমাজগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আর থাকিল না। পূর্ব ইওরোপে এতদিন ফিউডাল প্রথা টিকিয়া থাকিলেও বণিক ও ধনিকের আগমনকে সেখানেও ঠেকাইয়া রাখা যায় নাই; রাশিয়ায় যেমন প্রথম পিটার-এর আমল হইতেই দেখি যুগান্তরের সূত্রপাত হইতেছে। সম্রাট পিটার সচেতনভাবে রাশিয়ায় পশ্চিম ইওরোপের বণিকযুগের বৈশিষ্ট্য-গুলি আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—ব্যবসা-বাণিজ্য, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র-

শক্তি, বুর্জোয়া সংস্কৃতি প্রভৃতির সেদেশে প্রচলনে তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। ইতিহাসে তাঁহার বিশেষ স্থান এইজন্য।

উনিশ শতকের শেষের দিকে পূর্ব ইওরোপের সামন্তপ্রথা ক্রমে-ক্রমে ধনতন্ত্রের আশ্রয় লাভ করিতে লাগিল, যদিও রাষ্ট্রশক্তি বহুদিন পর্যন্ত প্রাচীনপন্থী থাকিয়া যায়। বিস্‌মার্কের আমলে জার্মানীতে অভিজাত জমিদার ও ধনিকদের মধ্যে আপসে বন্দোবস্ত হইয়া জার্মান সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল। আমেরিকায় বহুদিন পর্যন্ত উত্তরে পণ্য-বিনিময়ের প্রাথমিক ব্যবস্থা ও দক্ষিণে দাস সমাজ দেখা যায়; গৃহ-যুদ্ধের পর উত্তরে উদিত ধনিকতন্ত্র উভয়কেই গ্রাস করে। সুদূর প্রাচ্যে উনিশ শতকের শেষের দিকে জাপানের রূপান্তর ঘটে। ইও-রোপীয় বণিক ও পরবর্তী ধনিক সাম্রাজ্যের চাপে পৃথিবীর অন্যত্র পূর্বতন সমাজ লোপ পাইতে লাগিল। কোথাও বা, যেমন অনেকের মতে চীন বা আমাদের দেশে, এশিয়াটিক সমাজে এতকাল পরে সম্পূর্ণ ভাঙন ধরিল। ভারত সম্বন্ধে মার্কসের বিখ্যাত চিঠিগুলিতে আমরা তাহার পরিচয় পাই।

ধনতন্ত্রের পৃথিবী জয় একটা নূতন ব্যাপার, কিন্তু তাহার আর্থিক কারণ বোঝা শক্ত নয়। ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রকৃতিই হইল প্রসারের চেষ্টা। মূলধন খাটাইয়া লাভ না-হইলে ধনিক কখনো উৎপাদনের কাজে নামিবে না। লাভের অনেকখানি আবার নূতন মূলধনে পরিণত হয়। উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য এইভাবে বাড়িয়াই চলে। আগেকার সমাজে এই বাড়িয়া চলার বালাই ছিল না, কিন্তু ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক ঝোঁক এই দিকে। পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজারের বিস্তার প্রয়োজন। দেশের মধ্যে সাধারণ লোকের অবশ্য বিস্তর অভাব থাকিয়া যায়; কিন্তু তাহারা হয় সামান্য শ্রমিক, নয় দুর্দশাগ্রস্ত অন্য শ্রেণীর লোক, তাহাদের পর্যাপ্ত জিনিস কিনিবার অর্থসামর্থ্য কোথায়? তাই ধনিকদের পক্ষে বিদেশের বাজার দখল করা দরকার। এক ধনিকের সঙ্গে অন্য ধনিকের প্রতিযোগিতা চলে পণ্য বিক্রয় লইয়া; দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা কমাইয়া আনিলেও এক ধনতান্ত্রিক দেশের সহিত অন্যের আর্থিক রেষারেষি থাকিয়া যায়। কাজেই নূতন নূতন বাজার খোঁজার তাগিদ আসে। কাঁচা মাল অনেক সময় আনিতে হয় বিদেশ হইতে; তাই অনুন্নত দেশগুলিকে আয়ত্তে আনিতে পারিলে সুবিধা। প্রতি-যোগিতার ফলে দেশের মধ্যে ধনিকের লাভের হার কমিতে থাকে;

তখন অনুন্নত বিদেশে, যেখানে বেশি মুনাফার সম্ভাবনা সেখানে টাকা খাটানোও লাভজনক। ধনতন্ত্রের এই-সব আর্থিক বিশেষত্বগুলি নূতন জিনিস—পুরাতন কোনো সমাজে তাই প্রসারের এত প্রবল ঝোঁক দেখা যায় না। আর-একটা কথাও উল্লেখযোগ্য। বিস্তারের একটা সীমা আছে, পৃথিবী অনন্ত নয়। তাই ধনিক দেশগুলির মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, তাই যুদ্ধের পর যুদ্ধ আসে। অন্যদিকে কিছুদিন পর-পর ধনতন্ত্রের আওতার মধ্যে দেখা যায় আর্থিক সংকট। যুদ্ধ ও সংকটের মধ্যে ধনতন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয়।

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা

সাম্যবাদে সর্বস্বীকৃত প্রামাণিক লেখা এখন পর্যন্ত শুধু মার্কস, এঙ্গেলস, এবং লেনিনের। মানুষের সমস্ত ইতিহাসের একটা সম্পূর্ণ ছবি আঁকিবার সময় তাঁহাদের কাহারো জোটে নাই। মার্কসবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইতিহাসের ধারার কথা লিখিতে গেলে তাই আমাদের ভুল-চুকের সম্ভাবনা অনেকখানি থাকিয়া যায়। এ-বিষয়ে যে-কোনো লেখকের বিশেষ কোনো মত সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে। ভুল হইলে সংশোধনের উপায় অবশ্য ইতিহাস লইয়া আরো বেশি আলোচনা। কিন্তু বিশেষ মতের কথা ছাড়িয়া দিলেও মার্কসবাদী লেখায় একটা বিশিষ্ট দেখিবার ভঙ্গি ফুটিয়া ওঠে, তাহার সম্বন্ধে সাম্যবাদীরা এক মত। ইতিহাসের কোনো ঘটনা সম্বন্ধে বিশেষ সাম্যবাদী মতামত যথার্থ না হইতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা আজ চিন্তার জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

'সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বল্‌শেভিক) পার্টির ইতিহাসে' স্টালিন এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মূল কথাগুলির আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য অবশ্য অতি সরল, এমন-কি, স্থানে স্থানে কিছুটা ভ্রান্ত। সহজ অন্য বিবরণের অভাবে প্রাথমিক পাঠে তাঁহার বর্ণনা অনুসরণ করা চলে, তবে মনে রাখিতে হইবে যে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অতটা অনায়াসসাধ্য ব্যাপার নয়। ইহা লইয়া গভীর বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা উচিত। কিন্তু এখানে তাহা ঠিক সম্ভব নয়।

মার্কসের ইতিহাসকে দেখিবার ধরনের মধ্যে ডায়ালেক্‌টিক বিশ্ব-দৃষ্টির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় : ১. জগতের কোনো কিছু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন নয়, সব-কিছুর মধ্যেই দেখি অন্য অনেকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ। মানুষের ইতিহাসের যে-কোনো পর্ব সেইরূপ তখনকার নানা অবস্থার উপর নির্ভর করে ; কোনো সমাজকে বুঝিতে হইলে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা জানিয়া লইতে হইবে। বর্তমান যুগে দাসপ্রথা নিরর্থক, অনাবশ্যক, অস্বাভাবিক। কিন্তু যখন আদিম সাম্যতন্ত্র ভাঙিয়া পড়িতেছিল, তখনকার অবস্থায় দাসদের পরিশ্রমে

উৎপাদন খুবই স্বাভাবিক মনে হইত, তখন এই প্রথা সভ্যতার বাহন রূপে দেখা দিয়াছিল। ২. জগতে সব-কিছু পরিবর্তনশীল, সব-কিছুর মধ্যে দেখি এভলিউশন বা ক্রমবিকাশ চলিয়াছে, পুরাতনের শেষ হইতেছে আর নূতন মাথা তুলিতেছে। মানুষের সামাজিক জীবনেও তাই চিরস্থিরতা থাকিতে পারে না, পুরাতন বিধি-ব্যবস্থাকে শাশ্বত বা সনাতন বলিয়া আঁকড়াইয়া থাকা অস্বাভাবিক। ধনতান্ত্রিক সমাজ মানুষের শেষ কীর্তি হইতে পারে না; ফিউডাল সমাজ যেমন রূপান্তরিত হইয়াছিল, ইহারও তেমনি অবসান আসার পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ৩. জগতে পরিবর্তন আসে বিরোধের মধ্য দিয়া, সব-কিছুর মধ্যে আমরা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই পরস্পরবিরোধী শক্তির অবস্থান ও তাহাদের সংঘাত, সেই দ্বন্দ্বই সব কিছুকে পরিবর্তনের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। ইতিহাসের মধ্যেও তাই দেখি বিরোধের অস্তিত্ব, সামাজিক প্রগতির মূলে রহিয়াছে সমাজের ভিতরে দ্বন্দ্ব। আর্থিক অবস্থা সামাজিক জীবনে সব চাইতে বড়ো কথা বলিয়া যেখানেই শ্রেণীভেদ দেখিতে পাই সেখানেই শ্রেণী-সংঘাত প্রধান ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। সাম্যবাদ এই সত্যকে স্বীকার করিয়া লয়, অন্য সব মতের বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টি না-থাকায় তাহারা স্বাভাবিক সংঘাতকে চাপা দিয়া ভুল ধারণার সৃষ্টি করে। ৪. জগতে পরি-বর্তন ধীরে ধীরে আসিতে আসিতে হঠাৎ এক লাফে মস্ত বড়ো বদল হইয়া যায়, এক চেহারার জায়গায় আসে অন্য, নূতনের আবির্ভাব হয়। ইতিহাসেও বিপ্লবের আগমন স্বাভাবিক ও অনিবার্য। অবশ্য এই হঠাৎ পরিবর্তন আপেক্ষিক বিচার মাত্র। বিপ্লব ঠিক মুহূর্তের ব্যাপার হইতে পারে না। সমাজের মধ্যে পরিবর্তনের স্রোত বহিয়া চলে, কিন্তু পুরাতন ব্যবস্থা হঠাৎ ভাঙিয়া পড়ে, বিপ্লবের মধ্যে তখন নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিতে থাকে।

মার্কসের ইতিহাসকে দেখিবার ধরন শুধু ডায়ালেক্টিক নহে, তাহা পরিপূর্ণভাবে বস্তুবাদী : ১. বিশ্বসংসারে আমরা দেখি যে, বস্তুর অস্তিত্ব আগে, তাহার সম্বন্ধে চেতনা পরে ; জগতে নানা বস্তুর থাকা না-থাকা মানুষের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। বলা যায় যে, মানুষের চেতনা বা জ্ঞান আয়নার মতন, তাহাতে যাহার ছায়া পড়ে তাহাই আসল সত্য, ছায়াটা শুধু ছায়া মাত্র। ইতিহাসেও মানুষের আর্থিক জীবন, মানুষের বাঁচিয়া থাকার পদ্ধতিটাই আসল ব্যাপার;

মানুষের চিন্তা ও ধারণা সেই বাস্তব জীবনের প্রতিফলন। সেইজন্য ভিন্ন-ভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ, বিশ্বাস, আলাদা রকমের রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার মুলে রহিয়াছে ভিন্ন-ভিন্ন সমাজের আর্থিক গড়নের তফাত। দাসযুগ, সামন্ততন্ত্র এবং বুর্জোয়া সমাজের সংস্কৃতি আলাদা ধরনের; তাহার প্রধান কারণ আর্থিক ব্যবস্থার প্রভেদ। ২. বিশ্বসংসারে বস্তুর অস্তিত্বই প্রাথমিক সত্য, আর মানুষের চেতনায় তাহা প্রতিফলিত হয়; কিন্তু এই কথার অর্থ ইহা নহে যে, মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। ইতিহাসে তাই দেখি মানুষের মতামত, ধারণা, বিশ্বাস ও কাজ সমাজের বাস্তব অবস্থার ফল; কিন্তু এইগুলির আবার সেই অবস্থার উপর প্রভাব থাকে। মানুষের চেষ্টা সমাজের অবস্থা বদলাইবার পথে বাধা হইতে পারে, আবার সেই বদলকে সচেতন ভাবে সাহায্য করাও সম্ভব। ৩. বিশ্বসংসারে বিবর্তন ঠিক আকস্মিক নয়, তাহার নিজস্ব নিয়ম আছে, কাহারো খেয়াল অনুসারে ক্রমবিকাশের গতি ও লক্ষ্য স্থির হয় না। ইতিহাসের ধারাও তেমনি একটা খামখেয়ালীর ব্যাপার নয়, পরিবর্তনের একটা ধাঁচ থাকে, যে-কোনো জিনিস যে-কোনো সময়ে সম্ভব নহে, যুগধর্ম একটা বাস্তব সত্য। ইতিহাসে ক্রমবিকাশের একটা বিশেষ ধরন আছে। প্রাচীন সমাজে হঠাৎ সোশালিজম্ আসিতে পারিত না, ধনতন্ত্র হইতে সার্ফ-প্রথায় অথবা যন্ত্রযুগ হইতে আদিম অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব, ক্যাপিটালিজম্-এর রূপান্তর সমাজতন্ত্রের মধ্যেই সম্ভব। ৪. বিশ্ব-সংসার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে আছে, সেই বাস্তব জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা প্রকৃতিকে বুঝিতে ও কাজে লাগাইতে শিখি। ইতিহাসের প্রকৃতিও তেমনি মানুষের জ্ঞানের বাহিরে কোনো অলৌকিক রহস্য নয়, ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যা। ইহার সাহায্যে আমরা সমাজের প্রকৃতি ও পরিবর্তন বুঝি এবং সেই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে অনেকখানি সহজ করিয়া তুলিতে পারি।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ডায়া-লেকটিক বস্তুবাদের একটা বিশেষ প্রয়োগ মাত্র। এই ব্যাখ্যাকে আশ্রয় করিলে আমরা ইতিহাসের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একটা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি, ইতিহাসের ধারার একটা সমগ্ররূপ আমাদের মনে মূর্তি

গ্রহণ করে। আলোচ্য বিষয়টি এইভাবে আয়ত্ত করা সকল বিজ্ঞানেরই লক্ষ্য, সেই হিসাবে মার্কস ইতিহাসকে বিজ্ঞানের পদে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন।

প্রত্যেক যুগে মানুষের চিন্তায় নানা ধরনের মতবাদ প্রকাশ পায়। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা আমাদের বুঝাইয়া দেয় কোন্ মত, ধারণা বা বিশ্বাস পুরাতন ব্যবস্থার সমর্থক, যে-ব্যবস্থার দিন ফুরাইয়া আসিতেছে। যে-পরিবর্তন আসিতেছে তাহার সহায় অন্য মত বা প্রচেষ্টাও সেইসঙ্গে দেখা যায়, ভবিষ্যতে তাহাই প্রবল হইয়া উঠিবে। বিভিন্ন মতবাদের আপেক্ষিক মূল্য বিচার করিতে হইলে তাই ইতিহাসের ব্যাখ্যা আমাদের কাজে লাগে। রুশদেশে প্রবল নারদনিক মতের বিরুদ্ধে প্লেখানভ ও লেনিন যখন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁহাদের শিখাইয়াছিল যে, শ্রমিক-আন্দোলনের উপর রাশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশের অবস্থাও ইহার অনুরূপ। সাধারণ জাতীয়তাবাদ হইতে তাই এখন সাম্যবাদই বেশি সার্থক।

সমাজ যখন স্পষ্টই পরিবর্তনের পথে পা বাড়ায়, কেবল তখনই নূতন মতবাদ প্রসার লাভ করিতে পারে। এক যুগের উপযোগী ধারণা অন্যযুগে ব্যক্তিবিশেষের মাথায় আসিলেও কখনো ঠিক গড়িয়া উঠিতে পারে না, আমাদের যুগের জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব যেমন প্রাচীন ও মধ্য যুগে কল্পনার অতীত ছিল। এক যুগে যাহা স্বাভাবিক মনে হয়, অন্য যুগে তাহা অচল, দাস-প্রথার দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ চলে। সাম্য সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা আগে জল্পনা করিয়া থাকিলেও, সাম্য-বাদ তখনই আসিল যখন ধনতন্ত্রের অন্তর্বিরোধ আত্মপ্রকাশ করে। সাম্যবাদ তাই মার্কসের কল্পনার বাহাদুরি নয়, সমাজের আর্থিক পরিণতির প্রমাণ ইহার মধ্যে পাই। কিন্তু নূতন মতবাদ আর্থিক ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক ফল হইলেও, তাহার বিস্তারের উপর সেই ক্রমবিকাশের গতি আবার অনেকখানি নির্ভর করে। অর্থাৎ এ কথা সত্য যে, মার্কসবাদ যত ছড়াইয়া পড়িবে, ধনতন্ত্রের সমাজতন্ত্রে রূপান্তর হইবে ততই দ্রুত এবং সম্পূর্ণ।

এইখানে দুইটি ভুলের কথা মনে রাখা উচিত। অনেকে মনে করে যে, আর্থিক পরিবর্তন, বিপ্লব আপনা হইতেই আসিতে বাধ্য, আমাদের কিছুই করিবার নাই, হাত জোড় করিয়া ইতিহাসের গতি

দেখিয়া যাওয়াই মানুষের কাজ। এই মতকেই সাধারণত স্বতঃস্ফূর্তি-বাদ বলা হয়। মার্কসবাদ এই মতকে সবলে আঘাত করে। অপরে ভাবে যে, ইচ্ছা করিলেই আমরা ঘটনাস্রোতকে ঠিক নিজেদের খুশি-মত চালাইয়া যাইতে পারি, সমস্তই নির্ভর করে প্রবল ইচ্ছাশক্তির উপর। ইহা আর-এক প্রকারের ভুল, ইহাকে ভাববিলাসিতা বলা চলে। ইহার আর-এক নাম ইউটোপিয়ান কল্পনাপ্রবণতা। সাম্য-বাদীদের সযত্নে এই দুই ভুলই এড়াইয়া চলিতে হইবে।

মার্কসের ব্যাখ্যা অনুসারে সমাজের বাহিরের চেহারা নির্ভর করে ভিতরের আসল অবস্থার উপর। এইখানে প্রশ্ন ওঠে যে, এই বাস্তব অবস্থা কাহাকে বলে। কোনো-কোনো জড়বাদী ঐতিহাসিক বাস্তব অবস্থা বলিতে আশেপাশের ভৌগোলিক সংস্থান, জল-মাটির গুণ, আবহাওয়ার প্রকৃতি, লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতির কথা ভাবেন। কিন্তু দেখা যায় যে, এই সমস্তই অপরিবর্তিত থাকিলেও সমাজে পরি-বর্তন আসিয়াছে। আসলে যে-বাস্তব অবস্থার উপর সমাজের বাহিরের প্রকাশ নির্ভর করে তাহা আর কিছুই নহে, তাহা সমাজের আর্থিক গড়ন, উৎপাদনের প্রকৃতি (mode of production) হইল সেই বাস্তব অবস্থার মূল কথা। যুগে যুগে উৎপাদনের প্রকৃতি বদলাইয়া যাওয়াতেই ভিন্ন-ভিন্ন সমাজের উদয় হইয়াছে; ইওরোপে দাসসমাজ, সামন্ততন্ত্র ও ক্যাপিটালিস্ট সমাজের মূল পার্থক্য এই-খানেই। আবার এশিয়াটিক সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী একই ধরনের ছিল, তাহার কারণ বহুকাল সেখানে উৎপাদনের প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসে নাই। সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য উঠিয়াছে ও পড়িয়াছে সমাজ থাকিয়া গিয়াছে একই রূপ।

মানুষকে বাঁচিয়া থাকিলে উৎপাদন (production) করিতে হয় —খাওয়া-পরা, থাকিবার বন্দোবস্ত, হাতিয়ার বা যন্ত্র—এই সবের উৎপাদন ভিন্ন কোনো সমাজ টিকিতে পারে না। কিন্তু উৎপাদনের প্রকৃতি সব সময় এক নয়, তাহার ক্রমাগত বদল হইয়াছে। সুতরাং ইতিহাসের মূল গতির উৎস এইখানেই, অন্যত্র নয়। উৎপাদনের প্রকৃতি কিসের উপর নির্ভর করে তাহার আবার বিচার করিলে দেখিতে পাই যে, উৎপাদনের শক্তি (forces of production) আর উৎপাদনের সম্বন্ধ (relations of production) এই দুইটি ব্যাপার আছে; এই দুইয়ের মিলনে উৎপাদনের প্রকৃতি গড়িয়া ওঠে।

উৎপাদনের হাতিয়ার বা যন্ত্র, তাহার ব্যবহার-কৌশল, উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান ও সরঞ্জাম, যাহারা কাজ করিতেছে তাহাদের শক্তি-সামর্থ্য, এই সমস্তের সাধারণ নাম হইল উৎপাদনের শক্তি। মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় জিনিস কিভাবে কোন্ কৌশলে উৎপন্ন করিতেছে, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা উৎপাদনের শক্তি কী বুঝিতে পারি। উৎপাদনের অপর দিক হইতেছে এই কাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, আর্থিক সংগঠনের ধরন; তাহারই সাধারণ নাম উৎপাদনের সম্বন্ধ। উৎপাদনের উপাদানগুলি কাহার হাতে, তাহাতে কাহার সম্পত্তি বা অধিকার আছে, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বুঝি উৎপাদনের সম্বন্ধ কী। ইতিহাসে আমরা দেখি যে, উৎপাদনের শক্তি আর উৎপাদনের সম্বন্ধ বদলাইয়া চলিয়াছে; এই দুইয়ের মিলনে উৎপাদনের প্রকৃতি গড়িয়া ওঠে, সেই প্রকৃতিও তাই নানা রূপ গ্রহণ করে। উৎপাদনের প্রকৃতির উপর সমাজের আর্থিক গড়ন নির্ভর করে; সেই গড়ন নিয়ন্ত্রণ করে সমাজের বাহিরের চেহারা।

উৎপাদনের উপাদান অর্থাৎ means of production (যেমন ভূমি, ভূমিজ পদার্থ, হাতিয়ার বা যন্ত্র, অর্থবল ইত্যাদি) যখন গোষ্ঠী-বিশেষের সম্পত্তি হয় তখন আমরা দেখি শ্রেণী অথবা classকে। আদিম সমাজে এই-সব উপাদান গোষ্ঠীর সম্পত্তি না হওয়াতে শ্রেণীও ছিল না। শ্রেণীসমাজে বিভিন্ন শ্রেণী থাকে, তাহাদের মধ্যে বিরোধও অনিবার্য। এই বিরোধের মধ্য দিয়াই পরিণতির সময় সামাজিক বিপ্লব আসে। উৎপাদনের উপাদানে ব্যক্তিগত অধিকার লোপ পাইলে পর শ্রেণীহীন সমসমাজ আবার আসিতে বাধ্য।

এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার আগে কয়েকটি সাধারণ নিয়মের কথা বলা উচিত। প্রথমত, উৎপাদনের প্রকৃতি এক অবস্থায় থাকে না, বদলাইয়া চলে; সেই বদলের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজের মতামত, ন্যায়-অন্যায় ও মঙ্গল-অমঙ্গলের ধারণা, রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা, সংস্কৃতির চেহারা (ইংরেজীতে এইগুলির নাম (superstructure) পরিবর্তিত হয়। মানুষের আর্থিক জীবন যেমন, তাহার সামাজিক জীবন ও চিন্তার জগৎও তাহার ছবি। ইতিহাসের মূল সূত্র তাই উৎপাদনের প্রকৃতির যথার্থ রূপটির সন্ধান, যুগধর্মের বিশেষত্ব এইখানে, এক যুগ হইতে অন্য যুগের পার্থক্যের গোড়ার কথা এই।

দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনের সূত্রপাত হয় উৎপাদনের শক্তির মধ্যে ; পরে সেই পরিবর্তিত শক্তির অনুযায়ী নূতন উৎপাদনের সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে। আর্থিক ব্যবস্থা অথবা উৎপাদনের প্রকৃতিতে রূপান্তর আসার রীতি হইল এই। উৎপাদন শক্তি বদলাইলে শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের সম্বন্ধ বদলাইতে বাধ্য ; কিন্তু কিছুদিন পর্যন্ত নূতন উৎপাদনের শক্তির সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন উৎপাদন সম্বন্ধ চলিতে পারে। উৎপাদনের আগেকার সম্বন্ধ তখন উৎপাদনের নূতন শক্তির বিস্তারের পথে বাধা হইয়া ওঠে, কিন্তু কিছুদিন পরে সে বাধা ভাঙিয়া পড়িতে বাধ্য। দাসসমাজের শেষের দিকে আমরা দেখি যে, চাষের কাজে নূতন প্রথা, উৎপাদনের নূতন শক্তি দেখা দিয়াছে ; অনেকদিন পর্যন্ত কিন্তু পুরাতন উৎপাদন সম্বন্ধ, মালিকের সঙ্গে দাসের সম্বন্ধ, আগের মতন থাকিয়া যায় ; শেষ পর্যন্ত নূতন শক্তির জয় হইল, উৎপাদনের সম্বন্ধ হইল পুনর্গঠিত। আবার সামন্ততন্ত্রের শেষ অবস্থায় উৎপাদন শক্তির নূতন পদ্ধতির সূত্রপাত হইল ; তাহার চাপে কিছুদিন পর উৎপাদনের সম্বন্ধকে আবার বদলাইতে হইল। ধনতন্ত্রের মধ্যেও এখন প্রধান অন্তর্বিরোধ এইখানে—উৎপাদনের শক্তি বদলাইয়া চলিয়াছে, উৎ-পাদন চলিতেছে সংঘবদ্ধ পরিশ্রমে। অথচ উৎপাদনের সম্বন্ধ রহিয়াছে আগের মতন, সম্পত্তিবান ও বিত্তহীনদের প্রভেদ বাড়িয়া চলিয়াছে। পুরাতন উৎপাদন সম্বন্ধ এখন উৎপাদনের নূতন শক্তির পথে বাধা, পুরাতন সম্বন্ধকে তাই ভাঙিয়া পড়িতেই হইবে। সমাজ-তন্ত্রের আগমন যে অবশ্যম্ভাবী, সেই বিশ্বাসের মূল ইতিহাসের এই অভিজ্ঞতার মধ্যে।

তৃতীয়ত, উৎপাদনের নূতন শক্তির আবির্ভাব, যেমন আজিকার দিনের সম্মিলিত উৎপাদনের প্রথা, পুরাতন সমাজের মধ্য হইতেই আসে। নূতন ব্যবস্থা ভুঁইফোঁড় নয়, আকাশ হইতে তাহার হঠাৎ আগমন হয় না। বিশ্লেষণ করিয়া সমাজের মধ্যেই আমরা দেখিতে পাই কোন্ নূতন উৎপাদন শক্তি গড়িয়া উঠিতেছে ; তাহা হইতে বোঝা যায় যে, ভবিষ্যতের সমাজ কোন্ পথে চলিবে। এইভাবে আমরা বুঝিতে পারি, ধনতন্ত্রের রূপান্তর হইবে শ্রেণীহীন সমাজে, অন্য কিছুতে নহে।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে উপরে বর্ণিত ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বিবৃত হইয়াছে নিতান্তই সহজ সরল ভাবে। মার্কসবাদী

শিক্ষায় তাই সযত্নে এই প্রসঙ্গ আরো গভীরভাবে অনুশীলন করার সবিশেষ প্রয়োজন আছে।

সমাজতন্ত্রের সূচনা

প্রাচীন সমাজে যখন সত্য-সত্যই ভাঙন ধরে, উৎপাদনের শক্তিকে যখন নূতন পথে চালাইতে হয়, অথচ উৎপাদনের সম্বন্ধে পুরাতন রূপ থাকিয়া যাওয়াতে আর্থিক জগতে দেখা যায় বিশৃঙ্খলা ও প্রচণ্ড বিরোধ, সেই সময়কে ইতিহাসে যুগসন্ধি বলা যায়। ইতিহাসের ধারার আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি যে, এখন মানুষ আবার যুগ-সন্ধির কালে পোঁছিয়াছে। এবার পরিবর্তন কোনদিকে কোন্‌ভাবে আসিতেছে, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা আমাদের দেয় তাহারই সন্ধান। একমাত্র সাম্যবাদ ভিন্ন অন্য কোনো মতের এই যুগসন্ধি সম্বন্ধে বুঝিবার শক্তি কিংবা বলিবার কিছু নাই। সাম্যবাদ যে লোককে আকর্ষণ করে তাহার একটি কারণ এই।

বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে, ধনতন্ত্রে প্রধান অন্তর্বিরোধ হইল এই যে, একদিকে উৎপাদনে মিলিত সংঘবদ্ধ পরিশ্রম বাড়িয়া চলে, অন্যদিকে উৎপন্ন দ্রব্য হইয়া পড়ে মুষ্টিমেয় লোকের সম্পত্তি। মধ্যযুগে উৎপাদনের সমস্ত উপাদানগুলি—জমি, হাতিয়ার প্রভৃতি—টুকরা টুকরাভাবে অনেক লোকের হাতে ছিল; উৎপাদন চলিত খণ্ড খণ্ড ভাবে। উৎপাদনের সব উপাদানকে একত্র করিয়া, একসঙ্গে যুক্ত-ভাবে অনেকের পরিশ্রমে জিনিস প্রস্তুত করা ধনতন্ত্রের বিশেষত্ব; এই রীতি বাড়িয়াই চলিয়াছে। বড়ো বড়ো ফ্যাক্টরী, বড়ো বড়ো ফার্ম ছড়াইয়া পড়ে; নহিলে যন্ত্রের উপযুক্ত ব্যবহার করা অসম্ভব হয়। অর্থনীতির ভাষায় ইহাকে মিলিত সংঘবদ্ধ পরিশ্রম বলা যায়। অথচ বড়ো কারখানায় কিংবা অনেকখানি জমিতে কলের চাষে যাহা উৎপন্ন হইল, তাহাতে অধিকার থাকে শুধু কয়েকজন মালিকের, সমাজের অধিকাংশ লোক যাহারা এই কাজে খাটিতেছে —তাহাদের নয়। উৎপাদনের সম্বন্ধের মধ্যে এই মালিকী-প্রথা কিছুদিন পরে উৎপাদনের শক্তির বিকাশের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়।

কলের সাহায্যে মানুষের সমস্ত অভাব সহজেই মিটানো যায়. আগেকার সমাজে লোকের এই শক্তি ছিল না। সকল মানুষের যত

খাবার, কাপড়, বাড়ীঘর ইত্যাদির প্রয়োজন সমস্তই সহজে প্রস্তুত করা এখন সম্ভব—অথচ অভাব থাকিয়া যায় কেন? ইহার কারণ এই যে, উৎপাদন শক্তির যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব নয় মালিকদের অধিকার আছে বলিয়া। কোন জিনিস কতখানি উৎপন্ন করিতে হইবে তাহার নির্দেশ আসে মালিকদের কাছ হইতে, তাহারা আবার নিজেদের লাভের কথাই ভাবে। সমাজে কতটা কাপড়ের দরকার মালিকেরা তাহার বিচার করে না, তাহারা দেখে কত কাপড় বেচিয়া তাহাদের কত লাভ হইবে। উৎপাদনের শক্তি রহিয়াছে, অথচ তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে উৎপাদনের সম্বন্ধ, মালিকশ্রেণীর অস্তিত্ব, মুনাফার সন্ধান। কিন্তু উৎপাদনের নূতন শক্তি যখন আসিয়াছে, তখন শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের প্রাচীন সম্বন্ধকে বদলাইতেই হইবে। সেই বদল আসিবে মালিকশ্রেণীর উচ্ছেদে, তখন উৎপাদনের সমস্ত উপাদান হইবে সাধারণের সম্পত্তি। সেই ব্যবস্থার অপর নাম সমাজতন্ত্র বা সোশালিজ্‌ম।

আর্থিক বিরোধ ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রকাশ পায় অন্যভাবেও। প্রতি কারখানায় কাজ চলে নির্দিষ্ট প্ল্যান অনুসারে, সেখানে সমস্ত ব্যবস্থা আগে হইতে ভাবিয়া ঠিক করা হয়। কিন্তু গোটা সমাজে উৎপাদনের ব্যবস্থায় কোনো নির্দিষ্ট প্ল্যান নাই, কোন্ জিনিস মোট কতখানি প্রস্তুত করা হইবে তাহার সম্বন্ধে কাহারো দায়িত্ব থাকে না। কাজেই বাজারে দেখা যায় বিশৃঙ্খলতা, কখনো অতিরিক্ত জিনিস আসিয়া পড়ে, কখনো দেখা যায় পণ্যের অভাব। সমাজের গড়নের মধ্যে আবার বিরোধ দেখা যায় শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংঘাতে—বুর্জোয়াদের সঙ্গে মজুরের সংঘর্ষ তাহার মধ্যে প্রধান দ্বন্দ্ব।

ধনতান্ত্রিক জগতে এই অন্তর্বিরোধের ফলে সোশালিস্ট চিন্তা ও আন্দোলন দেখা দিল। ইহার সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ কথা জানিতে হইবে।

সমাজে আর্থিক সমতার আদর্শ প্রাচীন যুগের লোকের মনেও মাঝে মাঝে দেখা দিয়াছিল, কিন্তু যে চিন্তার সঙ্গে সেই সময়ের ক্রম-বিকাশের যোগ থাকে থাকে না স্বভাবতই তাহা সার্থক হইয়া উঠিতে পারেনা। তাই গ্রীকদের মধ্যে সাম্যভাবের ধারণা ছিল অতি সীমাবদ্ধ—দাসদের মালিকশ্রেণীর মধ্যে ছোটো ও বড়োর প্রভেদ ঘুচিবে, মালিকেরা সকলে সমান হইবে, ইহার বেশি কিছু তাহারা ভাবিতে

পারে নাই। মধ্যযুগে সাম্যের কল্পনা ছিল ছোটো ছোটো সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ, যেমন মঠের সন্ন্যাসীদের মধ্যে ; বাহিরে বিরাট সমাজের ভিতর অসাম্য দূর করিবার কোনো পরিকল্পনা দেখা যায় না, এমনকি মঠগুলিও করিত তাহাদের চাষীদের শোষণ। মধ্যযুগের রূপান্তর পর্বে সাম্যভাবাপন্ন ছোটো ছোটো উপনিবেশ গড়িবার চেষ্টা হইতেছিল, বিশেষত নূতন আবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশে ; অবশ্য তাহার সবগুলিই ব্যর্থ হইয়া যায়। সতেরো শতকের ইংরাজ বিপ্লবের সময় ডিগার আন্দোলনের মধ্যেও সমাজতান্ত্রিক কল্পনার আভাস দেখা দিয়াছিল। কিন্তু চারিদিককার বুর্জোয়া আবহাওয়ার মধ্যে এই ধরনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতে বাধ্য। আশেপাশের সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া ইহারা দাঁড়াইতে পারে না, সমানাধিকারী উপনিবেশের মধ্যেই কালক্রমে অসাম্য দেখা দেয়, অবাস্তব উদ্যম ভাঙিয়া পড়ে।

একমাত্র ধনিক যুগের আর্থিক অন্তর্বিরোধের ফলেই প্রকৃত সমাজতন্ত্রের উৎপত্তি হইতে পারে। তাই উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই প্রথম সোশালিস্ট চিন্তা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত মানুষের মধ্যে আর্থিক সাম্য আনিবার সংকল্প মানুষের মনে প্রবল ভাবে জাগিয়া উঠিল। নূতন আদর্শ ফুটাইয়া তোলার কাজে পথ-প্রদর্শক হিসাবে ফ্রান্সে সেণ্ট, সাইমন ও ফুরিয়ার এবং ইংল্যাণ্ডে রবার্ট ওয়েনের নাম উল্লেখযোগ্য।

অবশ্য নিছক কল্পনার দিক হইতে ইহাদের আদর্শকেও পথ দেখান এই সময় হইতে তিন শতাব্দী আগে চিন্তাশীল ইংরাজ পণ্ডিত টমাস মোর। উনিশ শতকের প্রথম সোশালিস্টদের 'ইউটোপীয়' নামটি দেওয়া হয় মোরের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'ইউটোপীয়া'র স্মরণে, যে গ্রন্থে এক কাল্পনিক সাম্যতন্ত্রী সমাজ বর্ণিত হইয়াছিল।

এই প্রথম সোশালিস্ট চিন্তাকে উদারনীতি বা লিবারেল এবং ডিমক্রাসি বা গণতান্ত্রিক মতবাদের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে দেখা যাইতে পারে।

বণিক-প্রধান প্রথম বুর্জোয়া যুগে উদারনীতির আবির্ভাব হয়, আর্থিক জগতে বণিকদের স্বার্থই চিন্তার রাজ্যে উদার-মতের রূপ লইল। উদার-মত অনুসারে অবাধ রাজতন্ত্র সমাজের উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ। এই মনোভাবের মূল কারণ এই যে, কেন্দ্রীভূত রাজ-

শক্তি ফিউডাল সামন্তদের শেষ আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছিল, ফিউডাল প্রতিপত্তি ও অধিকারগুলিকে স্বেচ্ছাচারী রাজারা সযত্নে রক্ষা করিত। অবাধ রাজশক্তির হাত হইতে শাসন ব্যবস্থা কাড়িয়া লইয়া কন্‌স্টিটিউশন অথবা নিয়মতন্ত্র স্থাপিত করিতে পারিলে সমাজে বুর্জোয়া আধিপত্যের পথে আর বাধা থাকিবে না। ইংল্যাণ্ডে প্রথম নিয়মতন্ত্রের আন্দোলন আরম্ভ হয়, সতেরো শতকের বিপ্লবে তাহা সফল হইল। নিয়মতন্ত্র আমেরিকায় ইংরাজ উপনিবেশগুলিতেও স্থাপিত হয়। ইংরাজ ও ফরাসী চিন্তার জগতে উদার আদর্শের বিস্তার ক্রমে মধ্যযুগের চিন্তাধারাকে পরাস্ত করিল। ফরাসী বিপ্লবের গোড়ার দিকে উদারনীতিরই জয় দেখি। ফিউডাল অধিকার ধ্বংস করিয়া দেশে প্রচার হইল যে, আইনের চোখে সকল মানুষ সমান, প্রকৃতির নিয়মই হইল এই। শাসনে কর্তৃত্ব থাকিবে প্রজাদের প্রতিনিধি-সভার, আইন অনুসারে সকলেরই সমান অধিকার থাকিবে স্বমত প্রকাশ করিবার এবং সেই মতে চলিবার, অভিজাতবংশে জন্মের জন্য কাহারো কিছু বিশেষ দাবি থাকিবে না। উদারনীতিকে ফরাসী বিপ্লবের ভাষায় নাম দেওয়া হইয়াছিল—মুক্তি, সাম্য এবং মৈত্রী। উনিশ শতকে এই ভাবধারা প্রবল বেগে বহিয়া চলিল, ইওরোপ হইতে পৃথিবীর সর্বত্র ইহা ছড়াইয়া পড়ে।

উদারনীতির সাম্যের আদর্শে মূল কথা আইনের চোখে সকলকে সমান জ্ঞান করা, অর্থাৎ অভিজাত ও সাধারণ লোকের মধ্যে আইনগত প্রভেদের অবসান। তাই বলিয়া সকলের সমান রাষ্ট্রিক অধিকার থাকিতে হইবে, প্রতিনিধি-সভার নির্বাচনে সকলের যে ভোট দিতে হইবে, উদার-মতের নেতাদের এমন বিশ্বাস ছিল না। অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণী প্রথমটা রাষ্ট্রশাসনে নিজেদের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব রাখিতে চায়। ইংল্যাণ্ডে এবং ফরাসী বিপ্লবের প্রথম কন্‌স্টিটিউশনে তাই দেখি ভোটের অধিকার দেওয়া হইল শুধু অবস্থাপন্ন লোকদের হাতে, সম্পত্তি না থাকিলে নাকি রাষ্ট্রিক দায়িত্ববোধ আসে না। কিন্তু পুরাতনকে উচ্ছেদ করিয়া নূতনকে আনিতে হইলে যে-বিপ্লবের প্রয়োজন, দেশের সাধারণ লোককে তাহার মধ্যে না-টানিলেও চলে না। আবার জনসাধারণ, বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি, ক্ষমতার আস্বাদ পাইলে সহজে ছাড়িবে না। আইনে সকলের অধিকার সমান হইলে, ভোটের বেলায় অন্যথা হইবে কেন? তাই পুরাতন,

উদারনীতির পাশে নূতন গণতন্ত্রের আদর্শ আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দাবি হইল রাষ্ট্রিক সাম্য, অর্থাৎ সকল লোকের সমান রাষ্ট্রিক অধিকার, সকলের ভোট দিবার ক্ষমতা। ফরাসী বিপ্লবের জ্যাকোবিন দল এই আদর্শকে নিজেদের লক্ষ্য করিল, ইংল্যাণ্ডের র‍্যাডিকাল মতেরও এই বৈশিষ্ট্য। গণতন্ত্র অথবা ডিমক্রাসির সূত্রপাত এইখানে। উনিশ শতকে এই নূতন আদর্শও দেশে-দেশে বিস্তার লাভ করে।

সকলের ভোটের অধিকার থাকিলে সমাজে আর কিছু চাহিবার থাকিবে না, ডেমক্রাটদের এই বিশ্বাস মজ্জাগত। লোকেরা সত্য-সত্য কোনো কিছু চাহিলে ভোটের সাহায্যেই তাহা করিতে পারিবে, আজ পর্যন্ত অনেকেই এই কথা ভাবিয়া থাকে। ধনিকেরা কিন্তু জানিত যে, আর্থিক ক্ষমতা থাকিলে সমাজকে নিজের ইচ্ছামত চালানো যায়, গণতান্ত্রিক শাসনেও তাহার কিছু অন্যথা হয় না। মানুষের জীবনের বেশির ভাগটাই আর্থিক অবস্থায় নিয়ন্ত্রিত হয়, আর্থিক ব্যবস্থায় প্রভুদের কর্তৃত্ব থাকিলে বাকিটার উপর মালিকের প্রভাব আপনা হইতে আসিয়া পড়িবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও তখন চলিবে মালিকদের স্বার্থে, সাধারণ লোকের ভোট থাকিলেও প্রকৃত স্বাধীনতা আসিবে না। এক শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় এখন সহজেই বোঝা যায় যে, আর্থিক অসাম্য থাকিলে রাষ্ট্রিক সমান অধিকার বেশি কাজে লাগে না, সাধারণ লোকের ভাগ্য ফেরে না। প্রথম-সোশালিস্টদের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তাহারা এই কথাটি সেই সময়েও ধরিতে পারিয়াছিল। তাই তাহাদের দাবি ছিল আর্থিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা। উদারনীতির আইনের চোখে সাম্য, গণতন্ত্রের রাষ্ট্রিক সমান অধিকার, তাহাদের তৃপ্তি দিল না ; তাহারা চাহিল সমাজে আর্থিক সমতা।

সোশালিস্ট আদর্শ তাই বলিল যে, সমাজে ধনী-নির্ধনের প্রভেদ উঠাইয়া দিতে হইবে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখা চলিবে না, দারিদ্র্যের অবসান হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু প্রথম-সোশালিস্টদের চিন্তায় অনেক গলদ ছিল। সমাজে সাম্যভাব কী করিয়া আসিবে সে-সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান ছিল না। আঠারো শতকের যুক্তিবাদী পণ্ডিতদের মতো তাহাদেরও বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ যুক্তি দিয়া নিজের কর্তব্য স্থির করে সকল ক্ষেত্রেই। তাহারা ভাবিল যে, সকলকে বুঝাইতে হইবে যে সাম্যভাবাপন্ন সমাজই আদর্শস্থানীয়, তাহা হইলেই তেমন

সমাজ আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। প্রচার করিয়া ধনিকের মন বদলাইতে হইবে, ধনিকেরা তখন নিজেরাই নূতন সমাজ গড়িয়া দিবে। ব্যক্তিবিশেষের কথা বাদ দিলে, একটা গোটা শ্রেণী যে শেষ পর্যন্ত চলে নিজের স্বার্থের সন্ধানে, এ কথা তাহারা বুঝিতে পারে নাই। বিরোধী স্বার্থের অস্তিত্ব তাহারা অস্বীকার করিত। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় ধনিকেরা যে সন্তুষ্ট, সেই ব্যবস্থা বদলাইতে যে তাহাদের আগ্রহ থাকিবে না, এ কথা তাহাদের মনে হইল না। সমাজে নির্যাতিত বিশেষত মজুরশ্রেণীই যে বিপ্লবের আসল সমর্থক, ইহা তাহাদের ধারণার অতীত ছিল। তাই প্রথম-সোশালিস্টরা শ্রমিক-আন্দোলন সম্বন্ধে ছিল উদাসীন। সমাজতন্ত্র তাহাদের কাছে ছিল একটা নূতন ধর্মের মতো, একটি-একটি করিয়া লোককে সেই ধর্মে দীক্ষিত করা ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। কার্যত সমাজে প্রতিপত্তিশালী ধনিকদের কবে মতি ফিরিবে ইহার মুখাপেক্ষী হইয়া তাহাদের দিন কাটিত। আজিকার দিনে পর্যন্ত দেশে-বিদেশে অনেক সোশালিস্ট নিজেদের অগ্রসর ও অভিজ্ঞ মনে করিয়াও এই প্রাচীন সংস্কারটুকুই আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। এই কারণে মার্কস প্রথম-সোশালিস্টদের নাম দিয়াছিলেন ইউটোপিয়ান অর্থাৎ অবাস্তব কল্পনাবিলাসী। তিন শতাব্দী আগের টমাস মোরের ইউটোপিয়া গ্রন্থের অনুসরণে ভবিষ্যতের স্বর্ণযুগের কী প্রকৃতি হইবে তাহার ভাবনাই ইহাদের বিভোর করিয়া রাখিয়াছিল।

অথচ সেই যুগেই শ্রমিক-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ধনতন্ত্রের বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে শোষিত মজুরশ্রেণী সংগ্রামে নামিয়াছে দেখিতে পাই। উনিশ শতকের গোড়াতে ইংল্যাণ্ডে মজুরদের নিজস্ব সমিতি ট্রেড ইউনিয়নগুলি গড়িয়া উঠিতেছিল। রবার্ট ওয়েন কিছুদিন এই আন্দোলনে যোগ দেন, তাহার পর তাঁহার আর ধৈর্যে কুলাইল না। ফ্রান্সে মজুরদের মধ্যে এই সময় ক্রমাগত ধর্মঘট চোখে পড়ে। ফরাসী বিপ্লবের আমলে বাবুফ প্রথম সমাজতন্ত্রী দল গড়িবার চেষ্টা করিয়া সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু মজুরেরাও শুধু অত্যাচারের প্রতিবাদ করিত, ধর্মঘট করিত, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় আন্দোলন শেষ হইত, নূতন কলকারখানা ভাঙিয়া ফেলিয়া ধনিকদের উপর প্রতিশোধ লইত। শ্রেণীহীন সোশালিস্ট সমাজের আদর্শ তাহারা ধরিতে পারে নাই, তাহাদের আন্দোলন ছিল শুধু ধনিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে অন্ধ নিষ্ফল

প্রতিবাদ। অনেকে আবার ভাবিত যে, গণতন্ত্রের আদর্শ, অর্থাৎ সকলের ভোটের অধিকার স্থাপিত হইলেই সমস্যা চুকিবে। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত চার্টিস্ট-আন্দোলন ও ফ্রান্সে লুই ব্লাঁর অভিযানে এই ভাবটা প্রবলরূপে দেখা দেয়।

একদিকে সোশালিস্ট আদর্শ, অন্যদিকে শ্রমিক-আন্দোলন, এই উভয়ের মধ্যে সংযোগ আনিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। ১৮৪৮ সালের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো এই যোগস্থাপন ঘোষণা করিল। মার্কসের হাতে একদিকে সোশালিস্ট চিন্তা কল্পনা-প্রবণতা ছাড়িয়া বিজ্ঞান-সম্মত মতবাদে পরিণত হয়। তিনি দেখাইলেন যে, ধনী-নির্ধনের প্রভেদ ঘুচিবে একমাত্র শ্রেণীভেদের অবসানের ভিতর দিয়া। ধনিকেরা স্বভাবতই ইহাতে বাধা দিবে, কিন্তু শ্রমিকদের নেতৃত্বে সকল শোষিত শ্রেণীকে এই উদ্যমে সংঘবদ্ধ করাই নূতন শ্রেণীহীন সমাজ গড়িবার উপায়। সাধারণের সম্পত্তি করিতে হইবে উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলিকে। যন্ত্রশক্তিকে মালিকদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া সমাজের কাজে লাগাইতে পারিলেই দারিদ্রের অবসান আসিবে। অন্যদিকে মার্কসের নেতৃত্বে শ্রমিক-আন্দোলনও তাহার পথ খুঁজিয়া পাইল। তাহার লক্ষ্য এখন আর শুধু অত্যাচারের প্রতিবাদ নয়, সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য সংগ্রাম। সোশালিজম ও সোশালিস্ট আন্দোলনের আসল আরম্ভ এইখানে।

অক্লান্ত পরিশ্রমে মার্কস ও এঙ্গেলস সারাজীবন সোশালিজমকে গড়িয়া তুলিবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

আধুনিক সোশালিস্ট মতবাদের সকল দিক প্রথম তাঁহাদের লেখার মধ্যে প্রকাশ পাইল। সোশালিস্টদের বিশ্বদৃষ্টির দার্শনিক নাম ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ, মার্কস ও এঙ্গেলস এই নূতন দর্শনের স্রষ্টা। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা তাঁহাদের অবিস্মরণীয় কীর্তি। অর্থনীতির বিশ্লেষণে তাঁহারাই প্রথম দেখাইলেন ধনতন্ত্রে আর্থিক শোষণ কিভাবে চলে, তাহার মধ্যে অন্তর্বিরোধ কোথায়, ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিণতি কোন্ দিকে, কিরূপে তাহার শ্রেণীহীন সমাজে রূপান্তর আসিবে। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তাঁহারা রাষ্ট্রের প্রকৃতি বুঝাইলেন, বিপ্লব কেন অবশ্যম্ভাবী ও কেমন করিয়া তাহার আয়োজন করিতে হইবে নির্দেশ দিলেন, বিপ্লবের পর মজুরশ্রেণীর অধিনায়কত্বের কথা বলিলেন, মূল লক্ষ্যে অবিচলিত থাকিয়া প্রয়োজন অনুসারে

সাময়িক কার্য-প্রণালী বদলাইবার কৌশল শিখাইলেন।

আধুনিক সোশালিস্ট আন্দোলনের সকল দিকও তাঁহাদের কর্মের মধ্যে প্রকাশিত হইল।—মজুরদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন যাহাতে স্বতঃস্ফূর্তির স্রোতে গা-ভাসাইয়া না চলে, মার্কস ও এঙ্গেলস তাহার বিশেষ চেষ্টা করেন; ট্রেড ইউনিয়নগুলি যেন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন হইতে দূরে না-চলিয়া যায় সেদিকে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করার ফলেই পরে রুশদেশে মার্কসবাদের পথ হইতে এক বিচ্যুতি. ইকনমিজ্‌ম-এর উৎপত্তি হয়। ট্রেড ইউনিয়ন হইবে শ্রমিকদের শ্রেণী-প্রত্যয় জাগাইয়া তুলিবার এবং তাহাদের সংঘবদ্ধ করিবার উপায়, তাহারা হইবে শ্রেণী-সংগ্রাম বুঝিবার ও শিখিবার বিদ্যালয়ের মতন, ইহার মধ্য দিয়া সোশালিস্টদের সঙ্গে সাধারণ মজুরের নিবিড় যোগ গড়িয়া তুলিতে হইবে।—মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমিক-শ্রেণীর নিজস্ব স্বতন্ত্র পার্টির প্রয়োজনীয়তা বুঝিলেন, পার্টি গড়িবার চেষ্টাও করিলেন, যদিও তখনকার দিনের অবস্থা ইহার অনুকূল ছিল না। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর পিছনে এরূপ দল গঠনের চেষ্টা ছিল, পরে দেশে-দেশে সোশালিস্ট পার্টি গড়িয়া ওঠে তাঁহাদেরই উৎসাহে; তাঁহাদের উপদেশ ও পরামর্শ ছিল ইহাদের সহায়। বিশেষ করিয়া ফ্রান্স ও জার্মানীতে সোশালিস্টদের প্রত্যেকটি সংকট ও সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহারা যে-চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার মূল্য তখন অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে না-পারিলেও আজিকার দিনে আমরা বুঝিতে শিখিয়াছি। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নিজেদের মধ্যে পত্রাবলী ও অন্য সোশালিস্টদের কাছে লেখা চিঠিপত্র আজও সাম্যবাদীদের অমূল্য সম্পদ ও চিন্তার খোরাক হইয়া রহিয়াছে।—বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে একসঙ্গে বাঁধিবার ও একপথে চালাইবার প্রথম চেষ্টাও তাঁহারা করিলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৬৪ সালে প্রথম ইন্‌টার্‌ন্যাশনাল, শ্রমিকদের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। প্রায় দশ বৎসর কাজের পর অবস্থা-বিপর্যয়ে এই প্রতিষ্ঠান ভাঙিয়া যায়, কিন্তু তাহার স্মৃতি, সকল দেশের নিঃস্বশ্রেণীর মহামিলনের আদর্শ, আজ পর্যন্ত আমাদের অনুপ্রাণিত করিতেছে।—শোষিত অন্য শ্রেণীর সঙ্গে মজুরদের সংযোগ স্থাপন, অবস্থা-বিশেষে প্রগতিকামী অন্য সকল দলের সঙ্গে সোশালিস্টদের সহযোগ, মার্কস ও এঙ্গেলস-এর এদিকেও দৃষ্টি ছিল। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময়

এই চেষ্টা দেখিতে পাই, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে তাহার স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে।

এইভাবে সোশালিস্ট মতবাদ ও সংগঠন উভয়কেই রূপ দিলেন মার্কস এবং এঙ্গেলস ; তাঁহাদের এ কীর্তি ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে।

সাম্যবাদকে বরাবর নানা বিচ্যুতি, নানা রকমের ভুল মত ও ভ্রান্ত আচরণের বিরুদ্ধে লড়িতে হইয়াছে। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর জীবনে তাহার পরিচয়ও পাওয়া যায়।—প্রথম-সোশালিস্টরা নূতন সমাজের আদর্শ প্রচার করিলেও আসল বিপ্লবের চেষ্টা হইতে সযত্নে দূরে থাকিতেন ; মার্কস তাঁহাদের ইউটোপিয়ান অর্থাৎ কল্পনাবিলাসী নাম দিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। অন্যদিকে ব্লাঙ্কির শিষ্যদের অভ্যাস ছিল নির্বিচারে সকল অবস্থাতেই বিদ্রোহের চেষ্টা করা ; মার্কস এই ছেলেমানুষী মনোভাবের নিন্দা করিতেন, কারণ যুদ্ধের মতো বিপ্লবেরও একটা কৌশল আছে, আবেগ ও উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে চলিলে শ্রেণী-সংগ্রামে জয়লাভ করা চলে না।—জার্মানীতে যখন সোশাল-ডেমোক্রাট দলের উদয় হইল তখন তাহাদের মধ্যে লাসাল্-এর প্রভাব প্রবল ছিল ; লাসালের অনুবর্তীরা পার্লামেণ্টের রাজনৈতিক আন্দোলনেই মাতিয়া থাকিত ; নির্বাচনের ভোটযুদ্ধে জেতা, আইন-সভায় সংস্কারের চেষ্টা ইত্যাদিতেই হইত তাহাদের সকল শক্তির নিয়োগ। মার্কস ইহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন, কারণ ইহারা বিপ্লবের বাঁধা বুলি আওড়াইলেও কাজে শুধু ধনতন্ত্রকে জোড়াতালি লাগাইয়া বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। অন্যদিকে এনার্কো-সিণ্ডিকালিজম-এর অতি-বিপ্লবী উগ্র মতামতের প্রতিবাদ করিতে মার্কসের ক্লান্তি দেখা যায় না, প্রুধোঁ এবং বাকুনিনের বিরুদ্ধে তিনি সারাজীবন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এনার্কিস্টেরা সংগঠনের ধার ধারিত না, রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে তাহাদের বিশ্বাস ছিল না, সকল প্রকার রাষ্ট্রশক্তির উচ্ছেদই ছিল তাহাদের উপস্থিত কর্তব্য, প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আক্রোশকে উত্তেজিত করিয়া গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিলেই কাজ উদ্ধার হইবে এই ছিল তাহাদের মত। সিণ্ডি-কালিস্টদের মধ্যে অবশ্য শ্রমিক-সংগঠনের চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু তাহারা ভাবিত যে শুধু ধর্মঘটের সাহায্যে বিপ্লব আসিবে, শ্রমিকদের রাজনৈতিক পার্টি গঠন ও কৃষক প্রভৃতি অন্য শোষিত শ্রেণীর সঙ্গে

যোগস্থাপনে তাহাদের বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না।

সাম্যবাদের পথ হইতে যত রকমের বিচ্যুতি দেখা যায়, অতি-দক্ষিণ এবং অতি-বাম, প্রতিক্রিয়াশীল এবং উগ্র চরম, এই দুইভাগে তাহাদের ভাগ করা সম্ভব। কিন্তু মার্কস দেখাইলেন যে, এই দুই ধরনের বিচ্যুতিই মূলত এক অবাস্তবতার এ-পিঠ এবং ও-পিঠ, ভদ্র নরম ও তীব্র গরম মতের বাহিরের তফাত যাহাই হউক-না-কেন আসলে দুই-ই কাজে বর্তমান ব্যবস্থার সহায় ও সমর্থক হইয়া পড়ে। পরে রুশদেশে বলশেভিকদের অভিজ্ঞতায় বার-বার এই কথার প্রমাণ পাওয়া গেল। তেমনি আমাদের দেশের সকল বিচ্যুতির মধ্যেও দেখি অতি-দক্ষিণ এবং অতি-বাম মতামত ও কার্যপদ্ধতির অপূর্ব ও হাস্যাস্পদ সমাবেশ।

মার্কস ও এঙ্গেলস-এর মৃত্যুর পর ধনতন্ত্র নূতন দশায় উপস্থিত হইল। লেনিন ইহার নাম দিলেন ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্ অথবা সাম্রাজ্যতন্ত্র। মার্কসের লেখার মধ্যেই এই পরিণতির সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁহার বিশ্লেষণশক্তির আশ্চর্য প্রমাণ এখানেও দেখিতে পাই। কিন্তু সাম্রাজ্যতন্ত্রের আসল আত্মপ্রকাশ গত শতাব্দীর শেষ হইতে, তাই তাহার যথাযথ বর্ণনা লেনিনই প্রথম দিয়াছিলেন। এই ব্যাখ্যায় লেনিনের মার্কসবাদে অদ্ভুত অধিকার ও তাহাকে সম্প্রসারণ করিবার অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেল।

সাম্রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা প্রাচীন যুগেও দেখা যায়; মনে রাখিতে হইবে লেনিন-বর্ণিত ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম ও সাম্রাজ্যগঠন ঠিক এক জিনিস নয়। আধুনিক অর্থাৎ পরিণত ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যতন্ত্রের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লেনিন উল্লেখ করিলেন। প্রথমত, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুরাতন প্রতিযোগিতার নিয়ম অনেকখানি উঠিয়া গিয়া মুষ্টিমেয় ধনিকের হাতে একচেটিয়া আর্থিক কর্তৃত্বের সমাবেশ হইল। ট্রাস্ট, কার্টেল ইত্যাদি শক্তিশালী ধনিকের প্রতিষ্ঠান; তাহারা গ্রাস করিতে লাগিল আগেকার দিনের অপেক্ষাকৃত ছোটো ধনিক কারবারগুলিকে। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্কের মহাজনদের হাতে অর্থবল এবং কলকারখানার মালিকদের মূলধনের আর স্বাতন্ত্র্য থাকিল না; উভয়ে মিলিত হইয়া এক নূতন আর্থিক শক্তি দেখা গেল, তাহার নাম ফিনান্স্‌-ক্যাপিটাল. ধনিক সমাজে ইহাই এখন নেতৃস্থানীয় চালক শক্তি। বড়ো-বড়ো ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষেরা দেশের যন্ত্রশিল্পের

উপর ক্ষমতা বিস্তার করিয়া দেশের সমস্ত মূলধনকে আরো অল্পসংখ্যক ধনকুবেরদের আয়ত্তে আনিয়া ফেলিল। তৃতীয়ত, অগ্রসর দেশগুলির অতিরিক্ত মূলধনের পুঁজি দেশের মধ্যে যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করিতে না-পারায় অন্য দেশে আসিয়া কর্তৃত্ব করিতে থাকে, দুর্বল ও অনুন্নত দেশগুলিকে এমন বিদেশী পুঁজিপতিরা প্রবলভাবে শোষণ করিতে লাগিল। বিদেশে পণ্যদ্রব্যের চালান ছাড়াও অতিরিক্ত পুঁজিকে পশ্চাৎপদ দেশে খাটাইয়া প্রভূত মুনাফার বন্দোবস্ত হইল চতুর্থ বিশেষত্ব এই যে, প্রবল ধনিকদের ছোটো ছোটো দলের একচেটিয়া কর্তৃত্ব সারা পৃথিবী নিজেদের পৃথক-পৃথক এলাকায় ভাগ করিয়া লইবার চেষ্টা করে। পঞ্চম বৈশিষ্ট্য, প্রবল রাষ্ট্রগুলি, যাহাদের সাধারণত মহাশক্তি নাম দেওয়া হয়, নিজেদের মধ্যে সারা জগৎ দখল করিয়া বসিল, আর্থিক কর্তৃত্ব আরো বিস্তার করিবার আর নূতন ক্ষেত্র রহিল না।

লেনিন দেখাইলেন যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে মার্কস যে-অন্তর্বিরোধের কথা বলিয়াছিলেন, ধনতন্ত্রের নূতন পরিণতি সাম্রাজ্যতন্ত্রে তাহার কিছুমাত্র অবসান হয় নাই, বিরোধ বরং বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রথম অন্তর্বিরোধ, উৎপাদনের ব্যবস্থায় সংঘবদ্ধ সামাজিক পরিশ্রম অথচ উৎপন্ন দ্রব্যের উপর ধনিকশ্রেণীর মালিকানা, এই রীতির মধ্যে। সাম্রাজ্যতন্ত্রের আমলে উৎপাদনের পরিশ্রম আরো বেশি সংঘবদ্ধ, আরো সামাজিক হইয়া পড়িতেছে; কলকারখানার উন্নততর পদ্ধতির ফলে উৎপাদনের পরিশ্রম হইতেছে আরো একত্রিত, আরো কেন্দ্রীভূত। অন্যদিকে উৎপন্ন জিনিসে সম্পত্তির অধিকার আরো অল্পসংখ্যক ধনিকের হাতে আসিতেছে, আসল মালিকদের গণ্ডি হইতেছে সংকীর্ণতর। এই অবস্থায় বিরোধ বাড়িবেই, কমিতে পারে না। দ্বিতীয় বিরোধ, ফ্যাক্টরির মধ্যে কাজে নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত অথচ সমাজে ব্যাপক প্ল্যানের অভাব, এই প্রথার ভিতর। সাম্রাজ্যতন্ত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের বিস্তার হইলেও এই দ্বিতীয় বিরোধের অবসান হয় না, মুনাফার লোভে উৎপাদন এখনো চলে বলিয়া ইহার অন্যথা হইতে পারে না। আর্থিক সংকট তাই বাড়িয়াই চলিতেছে, তাহার শেষ হইতেছে না। তৃতীয় বিরোধ, বুর্জোয়া ও মজুরের দ্বন্দ্ব। সাম্রাজ্যতন্ত্রের আওতায় সেই বিরোধ হইতেছে তীব্রতর।

মার্কসের মত ছিল যে, অন্তর্বিরোধের ফলে ধনতন্ত্র ভাঙিয়া

পড়িবে। লেনিন সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সাম্রাজ্যতন্ত্রে যখন সকল বিরোধই প্রচণ্ড হইয়া উঠিল, তখন সেই ভাঙিয়া পড়া আসন্ন, ধনতন্ত্রের পতন আগতপ্রায়। তিনি তাই বলিলেন যে, সাম্রাজ্যতন্ত্র আর-কিছুই নয়, ধনতন্ত্রের শেষ দশা মাত্র। সাম্রাজ্যতন্ত্র হইতে বুঝিতে হইবে যে, ক্যাপিটালিজম্ মরিতে বসিয়াছে। ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রতি দেশে মালিক ও মজুরের যে-সংঘাত তাহা যে এখন বেশি প্রবল হইয়া উঠিবে শুধু তাই নয়, সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে আবার পরস্পারের রেষারেষি বাড়িতেছে। পৃথিবী অশেষ নয়, প্রসারের নূতন ক্ষেত্র আর দেখা যায় না, কাজেই নিজেদের মধ্যে দেশ ও বাজার লইয়া কাড়াকাড়ি ছাড়া মহাশক্তিদের আর উপায় কি? সাম্রাজ্যতন্ত্রের আমলে বরাবরই কোনো-কোনো সাম্রাজ্য চেষ্টা করিতে থাকিবে অপরকে জব্দ করিয়া নিজেদের সুবিধামত পৃথিবী নূতনভাবে ভাগ করিয়া লইতে। মহাযুদ্ধ তাই অনিবার্য, এইজাতীয় যুদ্ধের নাম দেওয়া হইল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। যুদ্ধের মধ্যে মজুরশ্রেণীরও বিপ্লব আনিয়া ফেলিতে পারিবে। লেনিন তাই বলিলেন যে, সাম্রাজ্যতন্ত্র হইবে মহাযুদ্ধ ও শ্রমিক বিপ্লবের যুগ। সাম্রাজ্যবাদের আরো একটি বিপদ আছে। শোষিত অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে প্রতিরোধের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিবে, সেই-সব দেশের জনসাধারণ শোষক বিদেশী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযান চালাইবে, তাহাদের সংগ্রাম হইবে সাম্রাজ্যতন্ত্রী শৃঙ্খল হইতে জাতীয় মুক্তির প্রচেষ্টা।

চারিদিকের অবস্থা বিশ্লেষণে এইভাবে লেনিন মার্ক্সের মূলনীতির প্রয়োগে অপূর্ব কৌশল ও কৃতিত্ব দেখাইলেন।

সাম্যবাদ লেনিনের হাতে পূর্ণতর ও বেশি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু ১৮৮৯ সালে স্থাপিত সোশালিস্টদের দ্বিতীয় ইনটারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানের প্রধান নেতাদের সে-সামর্থ্য ছিল না। তাঁহারা অন্য পথ ধরিলেন। কাউট্স্কি এবং হিল্‌ফারডিং সাম্রাজ্যতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেন অন্যভাবে। তাঁহাদের মতে ধনতন্ত্র ইম্পিরিয়ালিজম্-এ রূপান্তরিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যতন্ত্র ধনতন্ত্রের শেষ দশা নয়, তাহার নূতন রূপে পুনর্গঠন। প্রতিযোগিতার অরাজকতা উঠিয়া গিয়া ধনতন্ত্র বেশি স্থিতিশীল, দৃঢ় ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া উঠিতেছে। তাঁহারা অবশ্য বলিলেন যে, এই সংগঠিত ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্রেরই পূর্বাভাস, কিন্তু ধনতন্ত্র বিপ্লবের মধ্যে ভাঙিয়া পড়িবে না, ধীরে-ধীরে সংগঠিত ধন-

তন্ত্রের মধ্য দিয়াই গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে সমাজ সোশালিজম্‌-এ পৌঁছাইবে। কাউট্‌স্কি ও হিল্‌ফার্‌ডিং-এর এই মত প্রথম মহাযুদ্ধের পর গড়িয়া ওঠে; জার্মান সোশাল-ডেমোক্রাট দল তখন তাঁহাদের নির্দেশে ভুল পথে চলিতে থাকে। জার্মানির বর্তমান দুরবস্থার একটি কারণ সোশাল-ডেমোক্রাটদের এই ভুল নীতির অনুসরণ। ভুল ব্যাখ্যা ও ভুল নীতির ফল যে কত মারাত্মক, এই দৃষ্টান্তে তাহা বোঝা যায়। কাউট্‌স্কি ও হিল্‌ফার্‌ডিং সাম্রাজ্যতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ধনতন্ত্রের অন্তর্বিরোধ সম্বন্ধে মার্কসের সমস্ত শিক্ষাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

সাম্রাজ্যতন্ত্রের আমলে ইহার অনেক আগেই মার্কসবাদের নানা রকম ভুল ব্যাখ্যা ও বিকৃতি ঘটিতে থাকে। লেনিন এই বিকৃতিগুলির সাধারণ নাম দিয়াছিলেন সুবিধাবাদ। ধনতন্ত্রের শোষণের ব্যবস্থায় মজুরদের মধ্যে উঁচু স্তরের অনেকের আয় খুব সামান্য থাকে না, তাহাদের আর্থিক অবস্থা সাধারণ মজুরদের চাইতে হয় কিছু ভালো। শোষণ যে চলিতেছে সে-কথা ভুলিয়া গিয়া তখন তাহারা নিজেদের সাময়িক সামান্য স্বার্থের খোঁজে থাকে। সুবিধাবাদের জন্ম এই ঝোঁকের মধ্যে। সুবিধাবাদের আসল অর্থ হইল সাময়িক ভাবে মজুরশ্রেণীর অংশবিশেষের সামান্য লাভের মোহে গোটাশ্রেণীর ব্যাপক ও স্থায়ী স্বার্থকে বিপন্ন করা। বাস্তব অবস্থা অনুসারে কার্যনীতির পরিবর্তনকে অবশ্য সুবিধাবাদ বলা চলে না।

সাম্রাজ্যতন্ত্রে যে-লুট চলে, তাহার বিপুল লাভের অল্প একটু অংশ উঁচুস্তরের মজুরদের ভাগ্যে জোটে, তাহাদের নেতারা তখন মার্কসের ব্যাখ্যা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে বিকৃত করিয়া সুবিধাবাদ প্রচার করে, মজুর শ্রেণীকে ধনিকদের অংশীদার করিবার স্বপ্ন দেখে। ভিক্‌টোরীয় যুগে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক মহলে সুবিধাবাদের প্রথম প্রচলন, সাম্রাজ্যের লুটে ভাগ বসাইয়া তাহাদের নেতারা মার্কস্‌ ও এঙ্গেলসকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে। সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারলাভ করিলে প্রতি দেশে সুবিধাবাদ মাথা তুলিল। জার্মানিতে বের্ন্‌স্টাইন বলিলেন যে, মার্কসের অনেক মত বাতিল করিবার সময় আসিয়াছে; তিনি মার্কসবাদকে সংশোধিত করিতে চাহিলেন, বলিলেন যে অবস্থার পরিবর্তনে তাহার সংস্কার প্রয়োজন হইয়াছে। কাউট্‌স্কি তখন বের্ন্‌স্টাইনের তীব্র প্রতিবাদ করেন, কিন্তু পরিণামে দেখা গেল যে, কাউট্‌স্কির মধ্যেও সুবিধাবাদ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। রুশদেশে সুবিধাবাদ প্রকাশ

পাইল মেন্‌শেভিক্‌দের মতামতে এবং ইকনমিজম্‌ অর্থাৎ অর্থনীতি-সর্বস্ব শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে। দ্বিতীয় ইন্‌টারন্যাশনালের বেশির ভাগ সোশালিস্ট দলই ক্রমে ক্রমে সুবিধাবাদের প্রভাবে মার্কসের নির্দিষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত হয়। লেনিনের অসাধারণ কৃতিত্ব এই যে, তিনি বলশেভিক দলকে ঠিক পথে চালাইতে পারিয়াছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিতর দিয়া লড়াই-এর মধ্যে লেনিন মার্কসবাদের খাঁটি রূপটি উদ্ধার করিয়া তাঁহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলা যায়। রুশ বিপ্লবে বলশেভিকদের সাফল্য তাই আকস্মিক দৈবাৎ সৌভাগ্য নয়; লেনিনের নেতৃত্বে মার্কসের মূলনীতির অনুসরণ ও অবস্থা বুঝিয়া তাহার যথাযোগ্য প্রয়োগ এবং সম্প্রসারণ এই সাফল্যের মূলে।

এইসঙ্গে বামপন্থী ঝোঁকের বিরুদ্ধেও লেনিনের সংগ্রাম উল্লেখযোগ্য। তিনি প্লেখানভের মতনই নারদনিকদের ব্যক্তিগত সন্ত্রাসকাণ্ডের ঘোর বিরোধিতা করেন। অ্যানার্কিস্টদের নৈরাজ্যবাদ ও রাষ্ট্রের উচ্ছেদ করিবার বিপ্লব অভিযান তাঁহার কাছে ব্যর্থ উদ্যম ও অবাস্তব কল্পনা মনে হয়। বামমার্গীয় চরম কমিউনিস্টদের আচরণকে তিনি এক বিখ্যাত পুস্তিকায় শিশুসুলভ ব্যাধি আখ্যা দেন।

ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌-এর প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন বিচ্যুতির বিরুদ্ধে আজীবন যুদ্ধ ছাড়াও সাম্যবাদে লেনিনের দান অজস্র, তাহার মধ্যে অন্তত দুইটির উল্লেখ এখানে করা উচিত।

লেনিন-ই প্রথম প্রকৃত সাম্যবাদী দল গঠন করিয়াছিলেন, পৃথিবীর সর্বত্র সকল কমিউনিস্ট পার্টি এখন সেই নির্দেশ অনুসরণ করে। তাহার আগে সোশালিস্টদের আদর্শ হইয়াছিল বিরাট জার্মান সোশাল ডেমক্রাটিক পার্টি। সেই পার্টির সঙ্গে সাধারণ অন্য রাজনৈতিক দলগুলির গড়নের কোনো পার্থক্য ছিল না, সহানুভূতি-সম্পন্ন সকল লোককেই নির্বিচারে দলে লওয়া ছিল তখনকার নিয়ম। লেনিন বল্‌শেভিক পার্টিকে বাছা-বাছা প্রকৃত কর্মীর দলে পরিণত করেন, প্রত্যেক সভ্যকে পার্টির নির্দেশ মানিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইত, পার্টি হইল একটা সৈন্যদলের মতন সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুগত। পরিবর্তিত অবস্থায় পার্টি অবশ্য গণপার্টিতে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু তখনো নিয়মানুবর্তিতা চলিতে থাকে।

বুর্জোয়া-ডেমক্রাটিক বিপ্লবে সাম্যবাদীদের কর্তব্য নির্ধারণ লেনিনের অপর কীর্তি। পশ্চিম ইওরোপে বুর্জোয়া-ডেমক্রাটিক বিপ্লব উনিশ শতকেই আসিয়া গিয়াছিল, সেখানে তাহার পর মার্কস-বাদীরা শ্রমিক-বিপ্লবের আয়োজনেই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু রুশদেশে ও অন্যান্য অনুন্নত অঞ্চলে সে-বিপ্লব তখনো অনাগত। ফিউডাল ও প্রাচীন ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া বুর্জোয়া-ডেমক্রাটিক বিপ্লব ধনতন্ত্রকেই শক্তিশালী করিবে এই বিশ্বাসে সোশালিস্টরা সে-বিপ্লব সম্বন্ধে উদাসীন থাকিত, ইহার নেতৃত্ব ও দায়িত্ব শুধু বুর্জোয়া শ্রেণীর বলিয়া মনে করিত। লেনিন দেখাইলেন যে বুর্জোয়া-ডেমক্রাটিক বিপ্লবকে পরিপূর্ণভাবে সফল করার কাজে শ্রমিক শ্রেণীর ও সাম্যবাদী দলের যথেষ্ট স্বার্থ রহিয়াছে। প্রাচীন আর্থিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিতে পারিলে শ্রমিক অগ্রগতির পথই পরিষ্কার হইবে, এই বিপ্লবে মজুরেরা নেতৃত্ব লইতে পারিলে বেশি তাড়াতাড়ি ধনতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করা সম্ভব। এইজন্য লেনিন কৃষকদের সঙ্গে মজুর শ্রেণীর সংযোগের প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিচালনা এবং ইতিহাসে প্রথম সমাজবাদী সমাজ স্থাপনে পরিকল্পনার রূপরেখার নির্দেশও অবশ্যই লেনিনের কৃতিত্ব।

সাম্যবাদের বিশ্লেষণকে ঘটনার প্রবাহ সার্থক প্রমাণ করিল; প্রথম মহাযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, ও ধনতন্ত্রের জগদ্ব্যাপী আর্থিক সংকটে আমরা তাহার পরিচয় পাই। ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর রুশদেশে সমাজতন্ত্রের আরম্ভ হইল; প্রথমে লেনিন, পরে স্তালিনের নেতৃত্বে সেখানে যে-নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রকৃতি আজ আমাদের সুবিদিত। সোভিয়েট ইউনিয়নে উৎপাদনের প্রধান উপাদান ও অবলম্বনগুলি সাধারণের সম্পত্তি। নিজে পরিশ্রম না-করিয়া অপরকে খাটাইয়া, অপরের উৎপন্ন দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া, নিজস্ব সম্পত্তির দৌলতে, সেখানে কাহারও থাকিবার উপায় নাই। শোষণের তাই এত যুগ পরে অবসান হইল। শ্রমভেদ অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব কিছুটা থাকিয়া গেলেও শোষক ও শোষিতের প্রভেদ ঘুচিয়াছে, সকলেই এখন শ্রমজীবী। অন্যের উৎপন্ন জিনিস বেশি দামে বিক্রয় করিয়া ব্যক্তিগত লাভের পথ বন্ধ হইয়াছে। সমাজের প্রয়োজন অনুসারে সমস্ত উৎপাদনের ব্যবস্থা; উৎপাদনের

কাজ চলে সমাজের নির্দিষ্ট প্ল্যান অনুসারে, মুনাফার লোভে নয়। বড়ো কারখানা ও ব্যবসায় রাষ্ট্রশক্তির হাতে, উৎপাদনের অন্য কাজও হয় সংঘবদ্ধ ভাবে, এমন-কি চাষীরাও ঐকত্রিক চাষের ব্যবস্থায় দলবদ্ধ হইয়াছে, তাই সেখানে ক্ষেতের কাজেও কল চালানো সম্পূর্ণ সম্ভব। উৎপাদনের কাজে যাহারা নিযুক্ত, তাহাদের মধ্যে কাজের সম্বন্ধে অবিরাম আলোচনা ও পরামর্শ চলিতেছে, শুধু উপর হইতে হুকুম অনুসারে যে কাজ চলে তাহা নয়, কর্তব্য স্থির করিতেছে দেশের সকলে মিলিয়া। উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ানো সম্ভব হইয়াছে, যন্ত্রশক্তি দিন-দিন ছড়াইয়া পড়িতেছে, যাহারা খাটিতেছে তাহাদের উৎসাহের অন্ত নাই কেননা তাহারা জানে যে, পরিশ্রমের ফল অপরে আত্মসাৎ করিবে না। দেশে অভাব ক্রমশ মিলাইয়া যাইতেছে, সকলেরই অবস্থা হইতেছে সচ্ছল, বেকার-সমস্যার অবসান হইল, আর্থিক সংকট সকল দেশকে পীড়িত করিলেও সোভিয়েট ইউ-নিয়নকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। অবশ্য এই-সব পরিবর্তন আনিবার পথে অত্যাচার অনাচার এড়ানো সব সময় সম্ভব হয় নাই, কিন্তু বিপ্লবকেও কিছুটা মূল্য জোগাইতে হয়। নূতন সমাজ-ব্যবস্থার আওতায় নূতন জীবনের স্পন্দনও দেখা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্নি-পরীক্ষায় সোভিয়েট সমাজ অপরাজেয় নূতন প্রাণশক্তির পরিচয় দিল

১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যু হয়। তাহার পর সাম্যবাদী দলের নেতৃত্বে থাকেন তাঁহার অন্যতম প্রধান সহকর্মী যোসেফ স্টালিন। পৃথিবীর প্রথম বিজয়ী শ্রমিক বিপ্লবের পর নূতন সমাজতন্ত্রী সমাজ গড়িয়া ওঠে প্রধানত তাঁহার নির্দেশে। প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রট্স্কির মত ছিল যে, বিশ্ববিপ্লব ছড়াইয়া না পড়িলে রুশদেশে নূতন সমাজ গড়ার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। স্টালিন বলিলেন যে, বিপ্লব যখন ইচ্ছামত অন্য দেশে রপ্তানি করা যায় না তখন ক্ষমতা হাতে আসিবার পর রুশদেশে বিশ্ববিপ্লবের অপেক্ষায় দিন কাটানো বলশেভিকদের পক্ষে হার মানার শামিল। অথচ রাশিয়ার মতো বিরাট একটি দেশে নূতন সমাজের প্রথম পর্যায়, অর্থাৎ প্রাথমিক সমাজতন্ত্র গড়িয়া তোলা সম্পূর্ণ সম্ভব, লেনিন তাহারই নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যৎ ইতিহাস এই ব্যাপারে স্টালিনের একদেশেও সমাজতন্ত্র গঠনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সার্থক দূরদৃষ্টি প্রমাণ করে।

তাঁহার অপর প্রধান কীর্তি হইল, পর-পর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের ভিতর দিয়া সোভিয়েট রাজ্যে সমাজতন্ত্রকে বাস্তব রূপ দেওয়া। যে-সমাজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইতিহাসে কাহারো ছিল না, অল্প-দিনে তাহাকে খাড়া করিতে পারা এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। শ্রমজীবী রুশ জনসাধারণ ও শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব পার্টির প্রাপ্য এই গৌরব! একদেশে সফল সমাজতন্ত্র গঠন জগৎকে স্তম্ভিত করিল দুইভাবে। সামান্যবিত্ত দেশের পক্ষে নিজের চেষ্টায় অল্পদিনে বিশাল যন্ত্রশিল্প গড়িয়া তোলা পরমাশ্চর্য কথা। লক্ষ-লক্ষ ছোটো চাষীর চিরদিনের অভ্যাস আবার নিজের স্বতন্ত্র জমিটুকু আঁকড়াইয়া থাকা; তাহাদের যৌথ চাষ প্রথায় সম্মিলিত করিতে পারা বিপ্লবের পর নূতন সমাজ গড়িবার পথে দ্বিতীয় প্রধান বাধা অপসারণ হিসাবে অভিনন্দনের যোগ্য। যন্ত্রশিল্পের চরম বিকাশ এবং একত্রিত চাষ ভিন্ন অবশ্য বর্তমান যুগে সমাজতন্ত্র অসম্ভব।

ইম্পিরিয়ালিজম্‌কে ধনতন্ত্রের শেষ দশা বলিলে, ফাশিজম্‌কে তাহার মরণ-কামড় বলা চলে। সোভিয়েট ইউনিয়নে যখন ইতিহাসে নূতন সমাজব্যবস্থার সূচনা হইল, তখন ধনিক জগতের ভাগ্যে এক দিকে আসে রাষ্ট্রিক সমস্যা ও বিপ্লবের ভয়, অন্যদিকে আর্থিক দুরবস্থা ও সংকট। ধনিকতন্ত্র যেখানে-যেখানে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, সেখানেই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ফ্যাশিস্ট ব্যবস্থার আবির্ভাব হয়। ইটালিতে ফাশিজম্‌-এর জন্ম, জার্মানিতে তাহার প্রবলতম প্রকাশ, শেষে জাপানেও তাহার বিস্তার দেখা গেল। কিন্তু অন্যত্রও ইম্পিরিয়ালিজম্‌-এর মধ্যে ফাশিস্ট ঝোঁক রহিয়াছে, বিপদে পড়িলে ইম্পিরিয়ালিজম্‌-এর শেষ অস্ত্র ফাশিস্ট মত ও আচরণ।

ফাশিস্টেরা বলে, তাহারা নূতন সমাজ গড়িতেছে—আসলে প্রাচীন ধনতান্ত্রিক শোষণের উপর পর্দা টানিয়া, সমাজের প্রকৃত চেহারার উপর মুখোশ পরাইয়া, তাহারা নূতনত্বের মোহ আনিবার চেষ্টা করে। সেই পর্দা ছিঁড়িয়া ফেলা, সেই মুখোশ টানিয়া খোলা হইয়া ওঠে সাম্যবাদীদের প্রধান কর্তব্য।

ফাশিস্টরা নূতন সমাজ গড়িতে চাহিলে সাম্যবাদের উপর তাহাদের মর্মান্তিক আক্রোশ কেন? কারণ এই যে, মার্কস যে-শোষণের রূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন, ফাশিজম্‌ সেই শোষণকে বজায় রাখে, উপরে রঙের প্রলেপ লাগাইলেই পুরাতন নূতন হইয়া যায় না।

ডায়ালেক্‌টিক বস্তুবাদের উপর ফাশিস্টদের বিজাতীয় ক্রোধ, ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাহাদের গভীর অবজ্ঞা। তবে ফাশিজম্‌-এরও কিছু নূতনত্ব আছে। নবীন ধনতন্ত্রের যুগে যে-উদার নীতি ও গণতন্ত্রের প্রচার হইয়াছিল, তাহাতে জনসাধারণের হাতে খানিকটা ক্ষমতা আসিয়া পড়ে। বিপ্লবের মুখে শোষকদের মনে হয় এই ব্যবস্থায় বিপদ অশেষ। তাই জনসাধারণের সকল অধিকার কাড়িয়া লওয়াই ফাশিজম্‌-এর রীতি। ফাশিস্টদের তখন কাজ হয় দেশের মধ্যে জনসাধারণের সমস্ত স্বাধীন প্রতিষ্ঠান ভাঙিয়া দেওয়া, সামাজিক পরিবর্তনের সকল প্রচেষ্টা দমন করা, এমন-কি, সংস্কৃতির কণ্ঠরোধ করিয়া শোষণের ব্যবস্থাকে বজায় রাখা। অন্যদিকে আর্থিক সংকট ঠেকাইয়া রাখার জন্য প্রয়োজন হয় অন্য দেশ লুট করা, তাহাতে সাধারণ লোকের অসন্তোষ সাময়িকভাবে চাপা দেওয়াও চলিতে পারে। ফাশিজম্‌ হইয়া দাঁড়ায় জনসাধারণের শত্রু, সকল দুর্বল জাতির আতঙ্ক, সোশালিজম্‌-এর অন্তরায়, প্রগতির পথে প্রধান বাধা।

একদিকে নূতন শ্রেণীহীন সমাজের আশা-ভরসা, গণতন্ত্রের ফলে মানুষের যতটুকু লাভ হইয়াছে তাহাকে রক্ষা করার উদ্যম, স্বাধীন চিন্তা ও সংস্কৃতিকে বাঁচাইবার চেষ্টা; অন্যদিকে সকল প্রতিক্রিয়ার প্রধান বাহন, অত্যাচারের প্রবলতম অস্ত্রস্বরূপ, শোষণের শেষ সহায় ফাশিস্ট প্রভুত্ব। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইওরোপে, এমন-কি, সারা জগতের পক্ষে সমস্যা দাঁড়াইল এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌ পথ বাছিয়া লইতে হইবে। এই মূল কথাটুকু গত দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী যুগে ইতিহাসের প্রধান প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছিল বলা চলে।

ইম্পিরিয়ালিজম্‌-এর যুগে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সারা জগতে ছড়াইয়া পড়িয়া সবিশেষ পরিণতি লাভ করে বটে, কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত বিরোধ ও দুর্বলতা ক্রমশই বাড়িয়া চলে। ফলে একদিক হইতে আসিল পৃথিবী পুনর্বণ্টনের চেষ্টায় মহাশক্তিদের প্রথম মহাযুদ্ধ; অন্যদিকে দুর্বলতম সাম্রাজ্যের মধ্যে শ্রমিক বিপ্লব ও কৃষক-মজুরদের প্রভুত্ব লাভ। যুদ্ধান্তে তাই ধনতন্ত্রের আর আগেকার তেজ ও সুস্থ ভাব দেখা গেল না; বরং কয়েক বৎসরের মধ্যে ধনতন্ত্র আসিয়া পড়িল একটা স্থায়ী আর্থিক সংকটের মধ্যে; বেকার সমস্যা, বাজারের বিপর্যয়, ও অতিরিক্ত উৎপাদনের বিশৃঙ্খলায় দেশে-দেশে ক্যাপিটা-

লিজম্-এর ভিত টলমল করিয়া উঠিল। এই অবস্থাতেই ইম্পিরিয়া-লিজম্-এর মধ্যে প্রবল হইয়া ওঠে ফাশিস্ট প্রবৃত্তি ও ঝোঁক।

ইটালিতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফাশিজম্-এর প্রবর্তন হয়, সেখানে এই নূতন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি খানিকটা ক্ষীণভাবে আত্ম-প্রকাশ করে। ফাশিস্টেরা অত্যাচার ও অস্ত্রের জোরে শ্রমিক প্রতিষ্ঠান ও সকল প্রকার সোশালিস্ট সংগঠন ভাঙিয়া দেয়। অজ্ঞ জনসাধারণকে নানা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখা হয় তাহাদের পেশা; মুখে থাকে সমাজের পুনর্গঠনের বুলি অথচ কার্যত একচেটিয়া পুঁজি-বাদীদের প্রভুত্ব বজায় থাকিয়া যায়। সাম্রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টা ও যুদ্ধের আয়োজনের মধ্যে আসে বেকারদের কাজ জোটাইবার আংশিক ও সাময়িক চেষ্টা। দেশের মধ্যে সাধারণ লোকের গণ-তান্ত্রিক অধিকার, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও নিয়মতন্ত্রের বিধি-ব্যবস্থা লুপ্ত করিয়া গড়িয়া ওঠে বড়ো বড়ো ধনিক মহলের স্বার্থসন্ধানী নেতা ও অনুচরবর্গের যথেচ্ছ শাসনের প্রতিষ্ঠান।

জার্মানিতে ফাশিজম্-এর পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখা গেল হিট্‌লারী নববিধানের পরিকল্পনায় ও নাৎসিদলের একাধিপত্যে। প্রগতি-বাদীদের নিঃশেষ করিয়া সমগ্র জাতিকে অত্যাচারী দস্যুদলে পরিণত করিবার নূতন শিক্ষা চলিতে লাগিল। মহাযুদ্ধের পর ভের্সাইয়ের সন্ধিতে জামানির যেটুকু দণ্ডবিধান হয়, তাহার প্রতিবাদে প্রতিশোধ-স্পৃহা ইহার মূল প্রেরণা নয়। আর্থিক সংকটে জার্মান ধনতন্ত্রের আমূল সংস্কার আসন্ন হইয়া পড়িলে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিবার সংকল্পই ছিল নাৎসি অভিযানের মূলে। জনগণকে আসল শোষকদের ভুলিয়া গিয়া ইহুদি-নিধনের পথে চালনা করা হইল নাৎসিদের লক্ষ্য; জার্মান নর্ডিক জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার জনগণকে উন্মত্ত করিয়া তোলে। আশেপাশের দুর্বল জাতিকে পদানত করিয়া ফেলিয়া হিট্‌লার জার্মান ধনতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন, পৃথিবী-শাসনের প্রলোভন দেখাইয়া জার্মান জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করা হইল তাঁহার অস্ত্র।

ফাশিজম্-এর ঢেউ জাপানের সামরিক কর্তৃপক্ষকেও উৎসাহ দিল সে-দেশের পুরানো আমলকে স্থায়ী করিবার কাজে; সেখানেও আসিল দুর্বল পূর্ব এশিয়ায় প্রাধান্য বিস্তারের প্রচণ্ড আয়োজন। ফাশিজম্-এর বিভীষিকা দিকে-দিকে মূর্তি গ্রহণ করিতে থাকে এই ভাবে।

এদিকে সোভিয়েট দেশে মজুর-কৃষকের রাষ্ট্র ও সমাজ দিন-দিন শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছিল। প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ ও বিদেশী আক্রমণ ব্যর্থ করিবার পর সেখানে সোশালিস্ট সমাজ গড়িয়া তুলিবার দুঃসাহসিক অভিযান আরম্ভ হয়। দেশের যন্ত্রশিল্প শুধু যে সাধারণের আয়ত্তে আসিয়া মুনাফার স্বার্থের বদলে দেশবাসীর প্রয়োজনে লাগিল তাহা নহে; অভাবনীয় রূপে তাহার বিস্তার ও অঙ্গবৃদ্ধিও কম কৃতিত্বের কথা নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই পর-পর তিনটি পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের মধ্য দিয়া একদিকে আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা ও অন্যদিকে দেশের সম্পদ বহুগুণ বাড়াইবার আয়োজন সফল হইয়া উঠিল। সম্মিলিত যৌথ চাষের কল্যাণে গ্রামে পর্যন্ত নূতন সোশালিস্ট সমাজের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া ওঠে, যদিও ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া তাহার জন্য প্রচণ্ড মূল্য দিতে হয়। বহু জাতির নিবাস সোভিয়েট দেশে নূতন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আনিয়া দিল সকল জাতির পূর্ণ বিকাশের সুবর্ণ সুযোগ; অথচ সোভিয়েট রাজ্যগুলির জনগণের সাধারণ স্বার্থ এবং অভিনব সোশালিস্ট সমাজ গঠনের উদ্যম তাহাদের মধ্যে আনিল প্রচণ্ড ঐক্যের লৌহদৃঢ় বন্ধন। সোভিয়েটের এই নূতন সমাজ গড়ার কাজে নেতৃত্ব করিয়াছে কমিউনিস্ট পার্টি, পথনির্দেশ করিয়াছে স্টালিনের দূরদর্শিতা। ট্রট্স্কি ও তাঁহার অনুচরেরা পদে-পদে বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দেশবাসীরা তাহাতে বিভ্রান্ত হয় নাই। আজ ইতিহাসের অগ্রগতি ট্রট্স্কির প্রত্যেকটি ভুল পরিষ্কার ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছে। সেই-সঙ্গে অবশ্য আজ আমরা বুঝিতেছি যে স্টালিন দ্বিতীয় লেনিন ছিলেন না; অনেক ব্যাপারে তিনি অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করেন; বহু অনাচার তাঁহার আমলে অনুষ্ঠিত হয় যাহার মূল্য আজ পর্যন্ত আমাদের দিতে হইতেছে।

রাশিয়ার সমাজবাদের সাফল্য সারা জগতের জনগণের মনে নূতন আশার সঞ্চার করে। দেশে-দেশে সাম্যবাদী দল আজ গড়িয়া উঠিয়াছে। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে জনসাধারণের মধ্যে তাই নূতন সাড়া, আত্মনির্ভরের ভাব, নবীন সংকল্প দেখা গেল। পরাধীন দেশের মুক্তি আন্দোলনও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে থাকে। চীনের জাতীয় প্রগতির স্রোতে ভাঁটা আসিলে সেখানকার সাম্যবাদী আন্দোলনই আবার জাতীয় জাগরণের জোয়ার আনে। ওদিকে

ধনিক মহাশক্তিগুলির শাসকদের আপস-নীতি ফাশিস্টদের হাতে পৃথিবী সঁপিয়া দিবার উপক্রম করিতে থাকে। সেই বিপদের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হইল ইউনাইটেড ফ্রণ্টের নীতির নামে। প্রতি দেশে প্রতিক্রিয়াপ্রবণ ফাশিস্ট ঝোঁকের বিরুদ্ধে সকল প্রগতিবাদীকে সংঘবদ্ধ করা হইল ইহার লক্ষ্য ; দেশে-দেশে প্রগতির সমর্থক জনমতকে একসূত্রে বাঁধা হইল ইহার সংকল্প। ভবিষ্যতে সোশালিজম্-এর প্রসার সম্ভব করিতে হইলে প্রধান কর্তব্য হইল ফাশিজম্-এর বিনাশ, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা এবং সম্ভব হইলে তাহার প্রসার এখানে প্রথম সোপান।

আমেরিকান, বৃটিশ বা ফরাসী ধনতন্ত্রের অবস্থা প্রথম মহাযুদ্ধের পর অতখানি সংকটাপন্ন হয় নাই। তাহাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্য ও ধনবল বাজারের উপর পুরানো ব্যবস্থাই বজায় রাখিল ; সমাজে গণতন্ত্রের কাঠামো সেখানে তাই আগের মতনই থাকিয়া যায়। তবুও স্থায়ী আর্থিক সংকটের চাপ এখানেও ধনিকদের বিব্রত করে ; এবং রুশদেশে সোশালিস্ট বিপ্লব শাসকশ্রেণীর প্রাণে আতঙ্ক আনিয়া দেয়। নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমী ধনিকেরা বাহির হইতে আক্রমণ চালায় ও বিদ্রোহীদের সাহায্য করিবার চেষ্টা করে। ইহাতে ব্যর্থ হইবার পরও সোভিয়েট রাজ্যকে একঘরে করিয়া রাখিবার চক্রান্ত চলিল। হিট্‌লারের অভ্যুদয়ের পর পশ্চিমী শক্তিদের নূতন ফন্দি হইল ফাশিস্টদের তোয়াজ করিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে কাজে লাগানো ; এই মতলবই আপস-নীতি নামে সে-যুগের ইতিহাসে খ্যাত হইয়াছে। ফাশিস্ট শক্তির বিস্তার লাভ ও ক্ষমতা অর্জন ইহারই ফল। তাই ইটালিকে দেওয়া হইল আল্‌বেনিয়া ও ইথিওপিয়া গ্রাস করিতে ; জাপান প্রথমে মাঞ্চুরিয়া, পরে উত্তর চীন, ও শেষে সমস্ত চীনদেশে অধিকার বিস্তার করিতে অগ্রসর হইল ; স্পেনে গণতন্ত্র ধ্বংস করিয়া ফাশিস্ট ফ্রাঙ্কোর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে দেওয়া হয় ; জার্মানি প্রথমে পায় অর্থসাহায্য ও ভের্সাইয়ের সকল বন্ধন হইতে মুক্তি, পরে অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকারের অনুমতি। বিশ্বরাষ্ট্রসংঘকে শক্তিশালী করিয়া সকল জাতির সম্মিলিত ভাবে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাকেও সকল দিক হইতে ব্যর্থ করে এই আপস নীতি। ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক অন্তর্বিরোধ কিন্তু শেষ হইয়া যায় নাই। হিট্‌লার তাই আপস-নীতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবার

পর দুর্বল জ্ঞান করিয়া ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধেই প্রথম যুদ্ধে নামিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও আরম্ভ হইল সাম্রাজ্যবাদী সংঘর্ষ হিসাবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে লড়াই চলে দুই দলে, তাহার কোনো পক্ষের পরিপূর্ণ বিজয়ে জনসাধারণের মঙ্গল আসিত না, তাহাদের ভাগ্য ফিরিত না। কিন্তু ইওরোপ পদানত হইবার পর হিটলার একদিকে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আপস করিবার চেষ্টা করেন, অন্যদিকে সোভিয়েট রাশিয়াকে ধ্বংস করিবার অভিযান আরম্ভ হইল। সঙ্গে-সঙ্গে হিটলারী নববিধানের স্বার্থে বিজিত দেশের জনসাধারণকে বলি দিবার প্রচণ্ড প্রয়াস চলিল। সুবিধা বুঝিয়া জাপানও পূর্ব এশিয়া সম্পূর্ণ দখল করিয়া দুর্বল জাতিদের উপর নূতন শক্তিশালী সাম্রাজ্যতন্ত্রের চাপ স্থায়ী করিতে উদ্যত হয়। মহাযুদ্ধের চেহারা এইভাবে সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল, যুদ্ধ পরিণত হইল পূর্ণ ফাশিস্ট আধিপত্যের বিরোধী জনযুদ্ধে।

যুদ্ধের মধ্যেও তোষণ-নীতি পশ্চিমী শাসক সম্প্রদায়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার ভূত সম্পূর্ণভাবে ঘাড় হইতে না নামিলেও জাগ্রত জনমত ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাকে ফাশিস্ট-বিরোধী অভিযানে টানিয়া লইয়া চলে। নাৎসি-অধিকৃত সকল দেশে প্রতিরোধ-আন্দোলন জনসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্‌বুদ্ধ করিতে লাগিল। সোভিয়েট দেশের আশ্চর্য আত্মরক্ষা পৃথিবীর সর্বত্র আনিল জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা ও নূতন ভবিষ্যৎ গড়িবার দৃঢ় সংকল্প। ফাশিস্ট-বিরোধী যে-আন্দোলনকে আপস-নীতি বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, এতদিনে তাহার পুনর্জন্ম লাভ হয়। প্রগতিবাদীর চোখে তাই জনযুদ্ধ হইল মুক্তির প্রতীক, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। কোনো ক্রমেই ফাশিস্ট শক্তিদের কোনো রূপে সাহায্য না-করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল সকল দেশের প্রগতিবাদীর প্রথম কর্তব্য। জনগণের মধ্যে ঐক্য, আত্মশক্তির উদ্‌বোধন, মুক্তিকামী সকল দেশের জনসাধারণের মধ্যে গভীর সংযোগ এ-সময়ের প্রথম মন্ত্র।

চার বৎসর তুমুল সংগ্রামের পর ফাশিস্ট বিজয়ের দুঃস্বপ্ন দূর হইল, প্রগতির পথ হইতে দূর হয় এ-যুগের প্রধান বাধা। জনযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে নূতন সোশালিস্ট সমাজ হয় নিরাপদ। ইওরোপে দেশে-দেশে ফাশিস্ট-মিত্রেরা হইল উচ্ছন্নপ্রায়, জনসাধারণের ভাগ্যে আসিল মুক্তি ও আত্মবিকাশের সুযোগ। অনুন্নত

দেশেও জাতীয় ঐক্যের জোরে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা আর সুদূরপরাহত রহিল না। আমাদের সামনে যে-নূতন জগতের দরজা খুলিয়াছে, সেখানে যে এখনই সোশালিজম্ গড়িয়া উঠিবে তাহা নহে। কিন্তু দেশে-দেশে জনসাধারণের হাতে যদি এখন ক্ষমতা আসে, তাহা হইলে এ-যুগের গণতন্ত্র আর ঠিক সাবেকি আমলের বুর্জোয়া গণতন্ত্র থাকিতে পারে না, তাহাকে হইতে হইবে নূতন পর্যায়ের 'নিউ ডিমক্রাসি'— নয়া গণতন্ত্র। ভবিষ্যতের সমাজতন্ত্র গড়িয়া উঠিবার সেতু থাকিবে ইহারই মধ্যে। অবশ্য এই গড়িয়া ওঠা প্রক্রিয়াও বহুবর্ষব্যাপী হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

* * *

ইতিহাসের মূল ধারা নির্ণয় যেখানে লক্ষ্য, সেখানে বিশেষ কোনো যুগে ঘটনা-প্রবাহের সম্যক পরিচয় দেওয়া অসংগত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যে-পর্বে আমরা এখন আছি সে-সম্বন্ধেও কথাটুকু মনে রাখিতে হইবে। সাম্প্রতিক ঘটনার আবর্তের মধ্যে মূল স্রোত লক্ষ্য করা ছাড়া অন্য কিছুর আলোচনা এখানে তাই অপ্রাসঙ্গিক।

ফাশিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের সময় অনেকের মনে আশা আসে যে, যুদ্ধান্তের জগতে বিনা দ্বন্দ্বে প্রগতির জয়যাত্রা চলিতে থাকিবে, কেননা ফাশিস্ট প্রতিক্রিয়ার পরাজয়ের পর সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের আত্মসমর্পণ ছাড়া গতি থাকিবে না। ইতিহাসে প্রগতির এই অতি-সরল ধারণা অবশ্য ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের বিরোধী। প্রগতির পথ সরল রেখায় আগাইয়া চলে না, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে পথে পদে-পদে বাঁক আসে, অগ্রগতি ধরা পড়ে কেবল ব্যাপক বিচারেই।

সোজাপথে আগাইয়া চলিবার ঝোঁক প্রকাশ পাইল ১৯৪৫-এর ঘটনা কয়েকটির মধ্যে, ফাশিস্ট-বিরোধী মিলিত লড়াই-এর প্রভাব তখনো প্রবল ছিল। পট্‌স্‌ডাম চুক্তিতে বিজয়ী সরকারেরা ঠিক করে যে পাঁচটি প্রধান মহাশক্তি (আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন) এখন মিলিয়া-মিশিয়া একত্রে চলিবে এবং ভবিষ্যতে শান্তি-রক্ষার খাতিরে জার্মানিতে আবার অস্ত্রসজ্জা ও ফাশিস্ট মনোভাবকে মাথা তুলিতে দেওয়া চলিবে না। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থাপিত হইল যাহাতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সকল বিরোধের বিনাযুদ্ধে নিষ্পত্তি হইতে পারে, মানুষের কল্যাণসাধনে নানাবিধ উদ্যোগের ভিতর যাহাতে এক দেশের সহিত অন্যের সহযোগ অভ্যাসে

পরিণত হয়। নাৎসি কবল হইতে সদ্যমুক্ত দেশগুলিতে মিলিত প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতিনিধি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠাও অনেকখানি সাফল্যলাভ করিল। জনকল্যাণের আদর্শে আর্থিক সংস্কারের চেষ্টা দেখা গেল ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে।

কিছুদিনের মধ্যে কিন্তু এই সোজাপথে অগ্রসরে বাধা আসিল, যুদ্ধান্তের জগতেও পদে-পদে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া গেল। ফাশিজম্-এর পতন সাম্রাজ্যবাদকে ভোঁতা করিয়া দেয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাকে নির্মূল করিতে পারে নাই এ কথাও সত্য। আধিপত্যের এলাকা সংকুচিত হইয়া গেলেও সাম্রাজ্যতন্ত্রী শক্তি এখনো প্রচণ্ড। এবার তাহার নেতৃত্ব আসিয়া পড়ে মার্কিন ধনিকবৃন্দের হাতে। তাহাদের অর্থবল অজস্র, কর্মদক্ষতা অসাধারণ, অ্যাটম বোমা বানাইবার গুপ্ত কৌশল আবিষ্কৃত হওয়ায় সামরিক শক্তি অপরিমিত। দেশের মধ্যে শাসকশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব সে-দেশে এখনো অবিচল, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকল হইয়া পড়িবার অবস্থা সেখানে এখনো আসে নাই। মার্কিন নেতৃত্ব মানিয়া লওয়া ছাড়া সংকটাপন্ন অন্যদেশীয় ক্যাপিটালিস্ট মহলের গতি ছিল না। মহাযুদ্ধে সোভিয়েটের বিপুল জয় সমাজবাদের প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়াছিল, সেই হইতে এক মহা আতঙ্ক দেশে-দেশে ধনিক ও ধনিকমিত্রদের আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে থাকে, পুরাতন সমাজের মোহগ্রস্ত চোখে সাম্যবাদ হইয়া ওঠে আবার এক আসন্ন বিভীষিকা। ধনিক কর্তৃত্ব রক্ষা, ও সম্ভব হইলে বিস্তারের অভিযানে, এইভাবে নেতা হইল মার্কিন ধনিকশ্রেণী। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদী অন্য সরকারও বিশেষ-বিশেষ এলাকায় কিছু নিশ্চেষ্ট থাকে নাই।

যুদ্ধশেষের তুই বৎসর পরের জগতে মনে হইল যে, পৃথিবী ভাগ হইয়া গিয়াছে পরস্পরবিরোধী তুইটি শিবিরে। একদিকে মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলি, অন্যদিকে সোভিয়েটের অনুসরণে সমাজবাদী ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক জাতি ও জনসমূহ। মার্কিন চাপের ফলে শুরু হইল প্রচ্ছন্ন অথবা 'ঠাণ্ডা' লড়াই। ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইটালি, গ্রীস প্রভৃতি রাজ্যে রাজ্যশাসনে বামপন্থী নেতা বা দলের আর কোনো স্থান রহিল না। দেশে-দেশে ফাশিস্ট মিত্রদের উচ্ছেদ অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল। মার্শাল প্ল্যানে মার্কিন অর্থসাহায্য ও রাষ্ট্রিক মাতব্বরি পশ্চিম ও মধ্য ইওরোপে কায়েমি হইয়া বসে। ন্যাটো নামে পশ্চিমী সামরিক জোট গড়িয়া উঠিল। আট্‌লান্টিক

হইতে জাপান ও প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত নানা ঘাঁটিতে পশ্চিমী সৈন্য ও অস্ত্র-সমাবেশ সোভিয়েট দুনিয়াকে বেষ্টন করিয়া ফেলে। আণবিক যুদ্ধের হুমকি থাকিয়া-থাকিয়া চমকিত করিতে থাকে পৃথিবীর শান্তি-প্রিয় সাধারণ লোককে। মার্কিন চাপের তীব্রতম প্রকাশ দেখা যায় ১৯৫০-৫১ সালে কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপের ভিতর।

বাস্তব অবস্থার চাপে ধীরে ধীরে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী মহলকে পিছাইয়া আসিতে হয়। সমাজবাদী গণতান্ত্রিক শিবির ক্রমশ আরো শক্তি অর্জন করিতে থাকে। সেই শক্তিবৃদ্ধি বিশ্বশান্তির সহায়, কারণ সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্র নয়, বিকাশ ও প্রসারের জন্য তাহাকে যুদ্ধ-বিগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয় না। যুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার ক্ষতি হইয়াছিল প্রচণ্ডতম ; কিন্তু মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে শুধু যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণ হইয়া গেল তাই নয়, সমাজতন্ত্র গড়িবার কাজে দেশ পূর্ণোদ্যমে আবার আগাইয়া চলিল। নূতন সমাজের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তির নূতন প্রমাণ আসিল এইভাবে। পশ্চিমী ধনিকদের যুদ্ধলিপ্সাকে সংযত রাখে সোশালিস্ট সমাজের আত্মরক্ষার পর্যাপ্ত আয়োজন। আণবিক অস্ত্রের গুপ্তরহস্য সোভিয়েট বিজ্ঞানীর কাছে বেশিদিন অজানা থাকে নাই। ক্যাপিটালিস্ট দেশে শক্তি-শালী শ্রমিক আন্দোলন, তথাকথিত 'অনুন্নত' দেশগুলিতে জাতীয় জাগরণ, ধনিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিব্রত করিয়া তুলিল। সারা জগতের সাধারণ লোকের নূতন বিশ্বযুদ্ধে অমত ও আপত্তি আছে, কারণ যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির বোঝাটা পড়ে তাহাদেরই উপর। এখন বিশ্বশান্তি আন্দোলন জনসাধারণকে দলমত নির্বিশেষে ব্যাপক ভিত্তিতে সংগঠিত ও সক্রিয় করিতে থাকায় যুদ্ধের বিপক্ষে গড়িয়া উঠিল প্রবল প্রতিরোধ।

সাম্রাজ্যবাদীদের হঠিয়া আসিবার অন্য কারণও ছিল। যুদ্ধশেষের পর হইতে সাম্রাজ্যতন্ত্রের এলাকা ক্রমেই কমিয়া আসিতে থাকে। প্রথম বাহির হইয়া আসে পূর্ব ইওরোপের দেশগুলি—পূর্ব জার্মানি, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গারি, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, আল্‌বেনিয়া। ফাশিস্ট কবল হইতে মুক্তির অভিযান এখানে শুরু হয় প্রতিরোধ-আন্দোলনে, সম্ভব ও সম্পূর্ণ হয় রুশ-বাহিনীর বিজয় যাত্রায়। এই অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্বের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা তাই আসিতে না-পারায় নূতন ধরনের গণতন্ত্র—জনগণতন্ত্রের

উদয় হয়। কিছুদিন পর কতকটা অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে, রাজ্যশাসনভার স্থানীয় সাম্যবাদীদের হাতে আসে। জনগণতন্ত্রের নীতি হইল দেশে বুর্জোয়া ধনিক প্রভাব ও ব্যবস্থা ক্রমেই সংকুচিত করিয়া আনিয়া সাধারণ লোকের আর্থিক মুক্তি ও প্রগতির পথ পরিষ্কার করা; আদর্শ হইল শ্রমিকনেতৃত্বে ক্রমে সমাজতন্ত্র গঠনের দিকে অগ্রসর হওয়া; কার্যক্রমের মধ্যে প্রধান কথা, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সহযোগ। পূর্ব ইওরোপের বেশির ভাগ অঞ্চল অবশ্য পশ্চিমী প্রভাব-মুক্ত নয়, সাম্যবাদী আন্দোলন-ও সেখানে দুর্বল। জনগণতন্ত্রের অগ্রগতির পথে তাই অনেক বাধা আসিতে পারে, কিন্তু সাম্রাজ্যতন্ত্রের সাক্ষাৎ কর্তৃত্বের এখানে অবসান হইল বলা চলে।

সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য যুদ্ধান্তের কয়েক বৎসরের মধ্যে ভাঙিয়া পড়িল এশিয়া মহাদেশের গোটা দক্ষিণ মণ্ডলে এবং আফ্রিকার উত্তর ভাগে। অবশ্য এ-অঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে সংযোগ এত ক্ষীণ, এবং শ্রমিক আন্দোলন এমনই পশ্চাদ্‌পদ যে, সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবের স্থির পরাজয় আসিয়াছে ভাবিলে ভুল হইতে পারে। এখানে প্রগতির প্রকাশ দেখা গেল জাতীয় জনজাগরণে, তাহার প্রথম ফল দেশে-দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা। জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্র বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু বিজয়ী মিত্রপক্ষীয় সাম্রাজ্যগুলিরও কিছুদিনের মধ্যে প্রচুর রাজ্যক্ষয় হয়। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, ব্রহ্ম, সিংহলে ইংরাজশাসন শেষ হইল; ইন্দোনেশিয়া হল্যাণ্ডের হাত হইতে মুক্তি পাইল; ফরাসী সাম্রাজ্য পূর্বে ইন্দোচীনের অনেকখানি, পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকার কিছু অংশ নিজ আয়ত্তে আর রাখিতে পারে নাই। মধ্য প্রাচ্যে আরব জগৎ-ও বিদেশী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে আরম্ভ করে।

এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কিছুদিন পর একটা নূতন ঝোঁক শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে, তাহাকে মাঝে-মাঝে নিরপেক্ষ নীতি বলা হয়, অর্থাৎ মার্কিন-সোভিয়েট শক্তি-পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় ইহারা জড়াইয়া পড়িতে চাহে না। বাস্তব অবস্থায় এই ঝোঁক অবশ্য প্রগতিরই সহায় হইয়া ওঠে, কারণ এই নীতির ফল যুদ্ধোন্মুখ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের শক্তি হ্রাস, শান্তিকামী সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার তাহাতে প্রভূত লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। তাহা ছাড়া এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি অনুন্নত, স্বাধীনতা লাভের পর দ্রুত আর্থিক

উন্নতি আনিতে হইলে যে-পুনর্গঠনের প্রয়োজন আছে তাহা সাবেকি ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা সুকঠিন। বুর্জোয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই এ-সব দেশের সমাজতন্ত্রের দিকে পরিণামে ঝুঁকিয়া পড়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

সেই ঝোঁকে অনেকটা উৎসাহ আসে মহান চীন-বিপ্লবের ফলে। ১৯৪৯-এর পর মহাচীনের সুবিশাল ভূখণ্ড সাম্রাজ্যতন্ত্রের এলাকা হইতে বাহির হইয়া আসিল। চীন-বিপ্লব ইতিহাসে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব পার্টির দ্বিতীয় সার্থক সাফল্য, রুশ-বিপ্লবের উপযুক্ত উত্তরাধিকার ইহার মর্মকথা। চীনা সাম্যবাদীদলের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২১ সালে। ১৯২৭ পর্যন্ত চীনের কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয়তাবাদী কুয়োমিন্টাং দলের সঙ্গে হাত মিলাইয়া দেশের মুক্তি-সংগ্রামে যোগ্য অংশ গ্রহণ করে। তাহার পর জাতীয়তাবাদীরা চীনের সাম্যবাদকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল—কিন্তু দশ বৎসর ব্যাপী গৃহযুদ্ধে সাম্যবাদীদল আত্মরক্ষা করিয়া উত্তর পশ্চিমে ইয়েনান অঞ্চলে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়।

চীনে পার্টির এবার নেতৃত্ব আসিল মাওৎসেটুং-এর কাছ হইতে। কৃষিপ্রধান চীন দেশে কোটি-কোটি কৃষকদের দলে টানিতে পারা এবং নূতন যুগের উপযোগী 'নূতন গণতন্ত্রের' আদর্শ প্রতিষ্ঠা তাঁহার অন্যতম প্রধান কীর্তি। সাম্রাজ্যতন্ত্রের ও পুরাতন সামন্ততন্ত্রের অবশিষ্ট অংশের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন যখন মাথা তোলে, তখন ইতিমধ্যে সমাজতান্ত্রিক শক্তি পৃথিবীর বিস্তৃত অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে, সাবেকি ধরনের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আর প্রয়োজন বা সার্থকতা থাকে না। তখন জনগণের নূতন ধরনের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, তাহা আসলে সোশালিজম্ গঠনেরই সোপান স্বরূপ, জাতীয় পুনর্গঠন তাহার পদ্ধতি, সোভিয়েট গণ্ডীর ঘনিষ্ঠ সহযোগ তাহার প্রধান সহায়। শ্রমিকশ্রেণীর উপযুক্ত শক্তি ও নির্ভুল নেতৃত্ব থাকিলে তখন শুধু চাষী নয়, বুর্জোয়া মধ্যশ্রেণীরও একটা বড়ো অংশকে নূতন গণতন্ত্রের পতাকাতলে সমাবেশ করা সম্ভব।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীন গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে চীনা কমিউনিস্টেরা দেশরক্ষার কাজে প্রধান উদ্যোগী হয়, বিরোধীমনোভাব-সম্পন্ন কুয়োমিন্টাং সরকারের সঙ্গেও সহযোগিতা করে। যুদ্ধান্তের পর সাম্যবাদী দলের চেষ্টা সত্ত্বেও আবার গৃহযুদ্ধ আসিল। এবার

অঞ্চলের পর অঞ্চল কমিউনিস্ট মুক্ত এলাকায় পরিণত হয়, ১৯৪৯ সালে চীন-বিপ্লব হয় সম্পূর্ণ। জনগণতন্ত্র স্থাপনের পর চীন দ্রুতবেগে আগাইয়া চলিয়াছে, নূতন গণতন্ত্রকে সোশালিস্ট সমাজে পরিণত করিবার কাজে সফল পদক্ষেপ চোখে পড়িতেছে। যুদ্ধান্তের সাম্রাজ্য-বাদী শিবির দুর্বল হইয়া পড়ার একটা প্রধান নিদর্শন এই চীন-বিপ্লব। সমাজতন্ত্রের প্রসার ও প্রগতির প্রধান অবলম্বন হইতে পারে সোভিয়েট রাশিয়া ও নূতন চীনের গভীর সখ্য।

সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দুর্বলতার আরো এক দিক হইল ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত স্বার্থের সংঘাত, ক্যাপিটালিস্ট সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি। বাহিরের বিপদ নিতান্ত আসন্ন না-হইলে এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে চাপিয়া রাখা যায় না, ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার স্বাভাবিক ঝোঁকই এইদিকে। মধ্যপ্রাচ্যে ইংরাজ-ফরাসীর সঙ্গে আমেরিকার প্রতিযোগিতা ইহার এক সুবিদিত দৃষ্টান্ত।

মহাযুদ্ধের যে-আশঙ্কা পৃথিবীর বুকে ঘনাইয়া আসিয়াছিল, তাহার অনেকখানি অবসান এইভাবে আসিতে থাকে। বাস্তব ঘটনাস্রোতের ঘাত-প্রতিঘাত ইহার মূলে রহিয়াছে; সমাজতন্ত্র ও জনগণতন্ত্রের শক্তি-বৃদ্ধি, সাম্রাজ্যতন্ত্রের শক্তিক্ষয় তাহার পরিচয়। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা ও যুদ্ধের বিপদ কমিয়া আসিলে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক, দুই সমাজের কিছুকালের মতন পাশাপাশি অবস্থান অনিবার্য। কতদিন এই সহ-অবস্থান চলিবে তাহা ভবিষ্যৎই বলিতে পারে, কিন্তু সাম্য-বাদীদের ইহাতে আপত্তি নাই সংগত কারণেই। পাশাপাশি অবস্থান সম্ভব বিশ্বশান্তি বজায় থাকিলেই। সমাজতান্ত্রিক সমাজে যুদ্ধের প্রয়োজন বা তাগিদ নাই, বিশ্বশান্তি অবিচল থাকিলে সমাজতন্ত্রের ক্ষতি নাই, লাভ আছে। সারা পৃথিবীর সাধারণ লোকের শান্তির ইচ্ছার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক এলাকার স্বার্থের বিরোধ নাই। শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতায় ধনিকেরা ভয় পাইতে পারে, সমাজতন্ত্রের যে কোনো ক্ষতি হইবে না এই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস সোশালিস্ট জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসের বাস্তব গতি এখন শ্রেণীবর্জিত সমাজ গঠনের দিকে, এই সিদ্ধান্ত রহিয়াছে সে-আত্মবিশ্বাসের মূলে।

সোশালিস্ট সমাজের প্রসার, প্রগতি ও শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সাম্যবাদী নীতির নূতন বিকাশ, কার্যপদ্ধতির নূতন পর্যায়ের সূচনা খুবই স্বাভাবিক। তাহার দুইটি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আলোচনা

শেষ করিতে হইবে।

প্রথম-সোশালিস্ট বিপ্লবের পর আত্মরক্ষার খাতিরে অনেক ব্যাপারে চণ্ডনীতির আশ্রয় নিতান্ত স্বাভাবিক। প্রথম নূতন সমাজ গঠনের চেষ্টায় বহু ভুলচুক না-হওয়াই আশ্চর্য। অভিনব পথে যাত্রায় অনভিজ্ঞতা, দুঃসাহসিক ব্রতে অতিসাবধান মনোভাব—ইতিহাসের বিচারে এ-সব ক্ষমা না করা অসম্ভব। ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও ভুলভ্রান্তির ফলও নিদারুণ হওয়া বিচিত্র নয়। এই-সবের জন্য কিন্তু ইতিহাসে প্রগতি ব্যর্থ হইয়া যায় না, শুধু এইটুকুই প্রমাণ হয় যে, প্রগতির পথ সরলরেখা নয়, কম্বুরেখা বা স্পাইরালের অনুরূপ। কিন্তু অবস্থা বদল হইলে অবশ্যই এই প্রাথমিক চণ্ডনীতি নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তখন সমাজতন্ত্রের আওতার মধ্যেই উদারতর বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্তন যুক্তিসংগত হইবে, সোশালিস্ট সমাজ হইয়া উঠিবে আরো বেশি মাত্রায় গণতান্ত্রিক। এমন এক সুন্দর সমাজই ছিল মার্কসের চিন্তায়, এ কথা ভুলিলে চলে না। অবশ্য সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মূলে থাকিবে সমাজতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধি, সমাজবাদের প্রসার, সাম্রাজ্যতন্ত্রের অবসান—এ কথা ভোলাও অন্যায়।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সাম্প্রতিক অগ্রগতি তেমনি দ্বিতীয় এক সম্ভাবনাকেও বেশি বাস্তব করিয়া তুলিতেছে। নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সশস্ত্র বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ ছাড়াও দেশবিশেষে সমাজতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা আসিতে পারে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সোশালিজম্ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা এখন স্বীকার করিতেই হইবে। কমিউনিস্টদের ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই, কারণ শুধু বলপ্রয়োগের খাতিরে বল-প্রয়োগ কোনো প্রগতিবাদীর কাম্য হইতে পারে না। বিরাট ফরাসী-বিপ্লবের পর বহু দেশে বিনা রক্তপাতেই বুর্জোয়া বিধিব্যবস্থা স্থাপিত হইতে পারিয়াছিল সন্দেহ নাই। ধীরে-ধীরে পরিবর্তনের মাঝে হঠাৎ বিপুল পরিবর্তন, মার্কসবাদে বিপ্লবের অর্থ ইহাই; সশস্ত্র অভিযান ও রক্তপাত তাহার অনিবার্য অঙ্গ নয়। কিন্তু মার্কসবাদ এ-কথা বলে যে, বিরাট বিপ্লব কথার-কথা বা ধোঁকাবাজি নয়, সমাজের প্রকৃত পুনর্গঠন চাই, ভাঁওতা দিয়া লোক ঠকাইলে চলিবে না। আর শান্তির পথে সমাজবিপ্লব সফল হইলে তাহার মূলেও থাকিবে পৃথিবীর অন্যত্র সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি, দেশের মধ্যে কার্যত শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব। □